মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

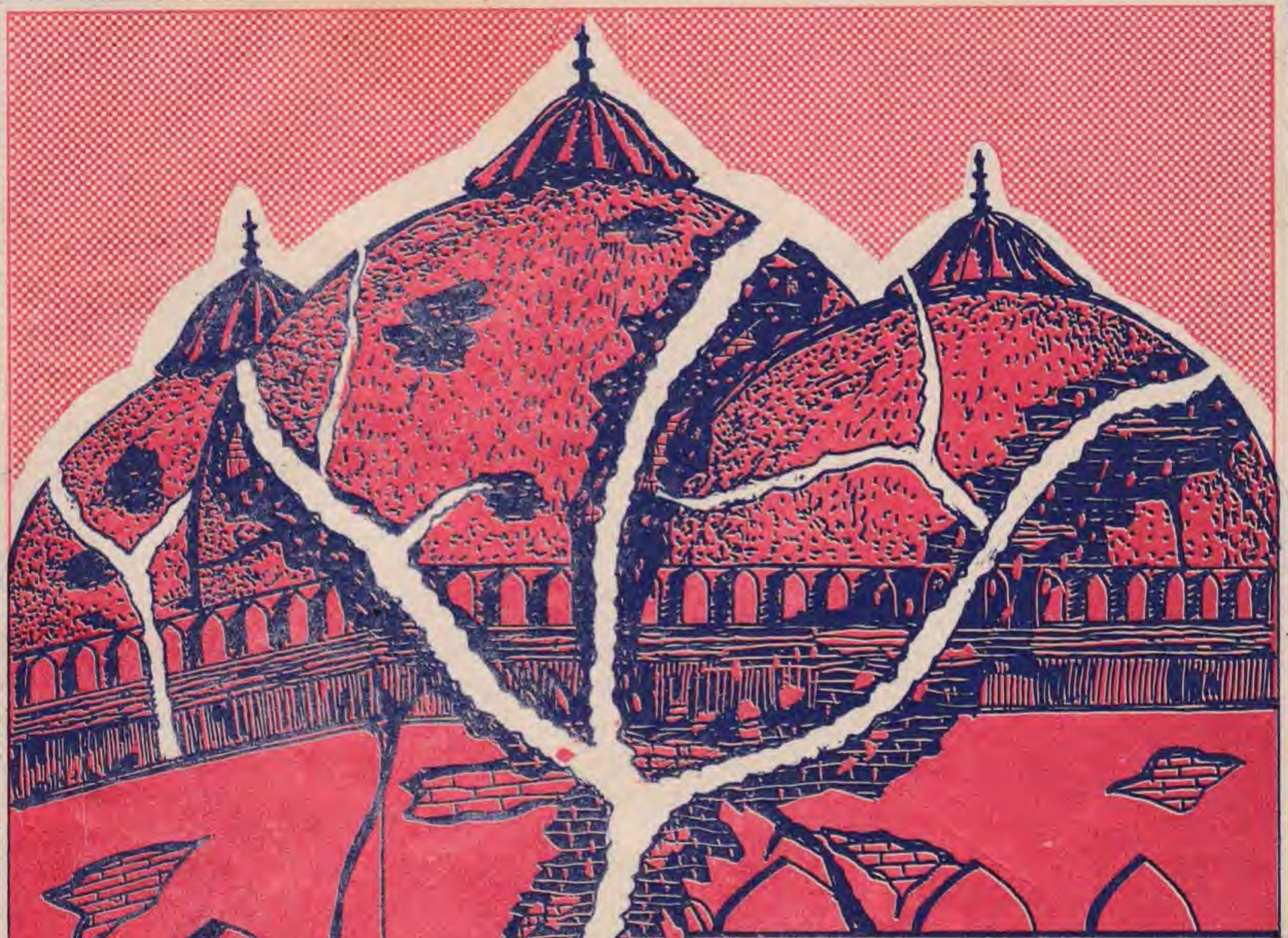

সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে?

বসনিয়ায় জাতিসংঘের সামরিক হস্তক্ষেপে আর কত রক্ত চাই!

৪৭০০০ হাজার মুসলমানের বাধ্যতামূলক হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ

ভারত ভাঙতে আর কত দেরী?

হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)—এর মনোনীত কাহিনী

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতাঃ
শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৮ পৌষ–১৩৯৯
৭ রজব–১৪১৩
১ জানুয়ারী –১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ
কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ
মুফ্‌তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ
হাবিবুর রহমান খান
মুফ্‌তী শফিকুর রহমান

মূল্য ঃ ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
সম্পাদক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা–১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯
অথবা
জি, পি, ও ,প্র নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা–১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম ২
* সম্পাদকীয় ৩
* ইসলামী জিহাদের মাইল ফলক জঙ্গে মানজিকার্ট
  লেঃ, কর্ণেল, এম, এম, কোরায়শী ৫
* সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে?
  আব্দুল্লাহ আল–ফারূক ৮
* বসনিয়ায় জাতিসংঘের সামরিক হস্তক্ষেপে আর কত রক্ত চাই?
  আব্দুল্লাহ আল–নাসের ১৩
* আমার দেশের চালচিত্র
  মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন খান ১৫
* ভারত ভাঙতে আর কত দেরী
  ফারূক আব্দুল্লাহ ১৭
* বাংগালী জাতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃত ইতিহাস
  ফজলুল করীম যশোরী ১৯
* ভারতের ৪৭০০০ মুসলমানকে বাধ্যতামূলক হিন্দুধর্মে দিক্ষিত
  শাব্বীর আহমাদ শিবলী ২১
* হাকিকুল উম্মত থানুভী (রাহঃ)–এর মনোনীত কাহিনী
  অনুবাদঃ ম· আ· মাহদী ২৪
* আমরা যাদের উত্তরসূরী
  আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী (রাহঃ)
  মুহাম্মাদ সালমান ২৬
* ব্যাঙ রচনাঃ অশুভ
  মোঃ দানিয়েল ২৯
* কবিতা ৩১
* প্রশ্নোত্তর ৩২
* নবীন মুজাহিদদের পাতা ৩৬
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা ৩৮

পাঠকের কলাম

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে বাধা কোথায়?

পূর্বকথা

১৮৫৭ সালে ভারত উপমহাদেশে মুসলমান সমাজ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতহচ্ছে। বাংলার বিদ্রোহী সিপাহীরা মুগল সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরে আনার জন্য সিপাহী আন্দোলন শুরু করছে। ঠিক তখনই দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জনসম্পদ ও ধনসম্পদ দ্বারা কোম্পানী সরকারের সহায়তায় এগিয়ে আসে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা। তার এই আচরণে খুশী হয় ইংরেজ সরকার। ভারত উপমহাদেশে তাদের আধিপত্য চিরস্থায়ীভাবে টিকে রাখার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেছে নেয় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে। গোলাম কাদিয়ানীও স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় কোন চাকুরীতে সুবিধা করতে না পেরে ইংরেজ সরকারের এ পৃষ্ঠপোষকতাকে নিজ জীবনের সম্বল ও সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বৃটিশদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে একদিকে ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য জিহাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও প্রচার অভিযান চালায়, অন্যদিকে নিজ ভক্ত বৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেকে মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ বলে দাবী করে এবং লোকজনকে তার বায়আত গ্রহণ করে মুরীদ হতে আহবান জানায়। তার মনগড়া ও মিথ্যা কাশফ, এলহাম ও ভবিভষ্যতবাণীর ব্যাপক প্রচারে প্রভাভিত হয়ে কিছু স্বার্থন্বেষী লোক তার চারপাশে জুটে গেলে সে ইসলামের অকাট্য ও সর্বস্বীকৃত আকীদা ও বিশ্বাসঃ "নবী মোহাম্মদ (সঃ)-এর পর আর কোন নতুন নবী ও রাসূল আসবে না তিনি হলেন শেষ নবী"। এ চিরসত্যকে অস্বীকার করে নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র নবী এবং রাসূল বলে দাবী করে বসে এবং কুরআন ও হাদীসের শত শত আয়াত ও বাণীর অপব্যাখ্যা ও মনগড়া অর্থের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সরল পাণ মুসলমানকে ধোকায় ফেলে এবং প্রতারিত করে। আর এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তি বৃটিশ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি বাতিল ফিরকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ওলামা মাশায়েখ ও মুসলিম বিশ্বের অভিমত

হাদীসের ভবিষ্যত বাণী অনুসারে ইমাম মাহদীর নাম হবে মোহাম্মাদ, তার পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ, মাতার নাম হবে আমেনা এবং তিনি মহানবী (সঃ)-এর বংশ থেকে জন্ম লাভ করবেন। ৪০ বছর বয়সে মক্কার হেরেমে তাওয়াফরত অবস্থায় তার সাথে লোকের সাক্ষাত হবে। কাদিয়ানী বইপুস্তুক ও প্রচার পত্রের ঘোষণানুযায়ী 'ইমাম মাহদী', 'প্রতিশ্রুত মসীহ' এবং 'নবী ও রসূল' হিসেবে মির্জা কাদিয়ানীর দাবীর সঙ্গে উপরের হাদীসের ভবিষ্যতবাণীর কোন মিল নেই। বিশ্বের সকল নেতৃস্থানীয় উলামা ও প্রসিদ্ধ মুফতিয়ানে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানী জামাতকে কাফির ফতওয়া দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিচয়কে (খাতামুন নাবীঈন বা শেষ নবী) অস্বীকার করে তারা প্রকারান্তরে কালেমায়ে ঈমানকেই অস্বীকার করেছে বলে সউদী আরব ও পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র সেদেশের উলামায়ে কেরামের স্পষ্ট ফতওয়া ও সর্বস্বীকৃত মতামতের প্রেক্ষিতে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে "অমুসলিম" (সংখ্যালঘু নাগরিক) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেন তারা ইসলামীর পরিভাষা ব্যবহার করে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোকায় ফেলে প্রতারিত করতে না পারে।

কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে

ইরাকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার সময় তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন আল আজাদ তাতে স্বাক্ষর করলেও সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এদের অপতৎপরতা দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। কাদিয়ানীরা নিজেরেদকে "আহম্মদিয়া মুসলিম জামাত" বলে পরিচয় দিয়ে সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে অমুসলিম কাদিয়ানী বানানোর চেষ্টায় তৎপর রয়েছে। কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কৌশল হিসেবে বেছে নেয় লোভনীয় চাকুরী, নগদ অর্থ এবং ইামেরিকান ভিসার প্রস্তাব। তাদের এহেন প্রস্তাবে অনেকেই সহজে বিভ্রান্ত হচ্ছে, সরে যাচ্ছে প্রকৃত ইসলাম থেকে। কাদিয়ানীদের মতে সারা বাংলাদেশে এক লক্ষের মতো কাদিয়ানী রয়েছে এবং ৩/৪ জন করে লোক প্রতিনিদ তাদের ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে।

এদের শক্তি কোথায়

দুঃখজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীর প্রায় প্রসিদ্ধ মুসলিম দেশগুলো কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বা সংখ্যালঘু ঘোষনা করার পর এখন তারা বাংলাদেশকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও মিথ্যা নবুওয়তের প্রচারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। বৃটিশ অর্থ সাহায্যে পরিচালিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পদে কর্মরত রয়েছে। যারা তাদের ক্ষমতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে এর প্রচার ও প্রসারের কাজে। সমগ্র দেশবাসী এবং আলেম সমাজ যেখানে এদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে একমত সেখানে দেউলিয়া বামপন্থী দলগুলোর প্রচ্ছন্ন সমর্থন এদের শক্তি যোগাচ্ছে বৈকী।

অমুসলিম ঘোষণা করুন

ইসলামের ইতিহাসে কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়সমূহ সরাসরি ইসলামের এতবেশী ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি যতবেশী ক্ষতি করেছে মুসলিম নামধারী মুনাফেকরা। ইসলামের প্রথম যুগ হতে আজ পর্যন্ত সর্বকালে সর্বস্থানে মুনাফেকরা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণায় লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানযুগে কাদিয়ানীরা সেই মুনাফেক ও ষড়যন্ত্রকারী দলসমূহের অন্যতম। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নৈতিক কর্তব্য এদের অপতৎপরতা বন্ধ করা এবং অমুসলিম (সংখ্যালঘু নাগরিক) ঘোষণা করা। এটা যত তাড়াতাড়ি হবে ততই জাতির মঙ্গল।

– আবদুল্লাহ সাঈদ / বায়তুল মোকাররম

সম্পাদকীয়

মুশরিক ও ইহুদীদের সাথে নতুন করে পরিচিতি হওয়া নিষ্প্রয়োজন

উনিশ'শ তিরানব্বই খৃষ্টাব্দের পয়লা মাসে প্রবেশ করেও '৯২ এর ঘটনাগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না বিশ্বের ১২৫ কোটি উম্মাতে মোহাম্মদী। অতিক্রান্ত বছরটির প্রথম ভাগে বসনিয়া হারজেগোভিনায় মুসলিম জনগণের বংশ নিপাতের যে অমানবিক যজ্ঞ শুরু হয়েছিল, বছর ফুরিয়ে গেলেও সে পাশবিকতার ইতি ঘটেনি। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দুরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলো চারশতাধিক বছরের প্রাচীন বাবরী মসজিদ। ফয়েজাবাদ জেলার অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক এ মসজিদটি ধ্বসিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে গোটা বিশ্বের মুসলমান বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধের প্রতিটি জনপদেই সমালোচিত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী পশুশক্তির এহেন হিংস্রতা ও উম্মত্ততা। ইট সুরকি আর চুন পাথরের মসজিদ ধ্বসিয়েই হিন্দুরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং গোটা ভারত ভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম হত্যার সুবর্ণ হোলি উৎসব। সহস্রাধিক মুসলমানের রক্তে রক্তে রেঙে উঠেছে রামের ধর্মরাজ্য। সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট উগ্র সংগঠনগুলোর ব্যানারে অযোধ্যার নাটক মঞ্চস্থ হলেও বিজেপি, বাজরং দল, করসেবক সংগ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতৃবিন্দের নাম বিশ্বময় প্রচারিত হলেও বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় ও হাজার সংখ্যক মুসলিম হত্যার পেছনে মূলতঃ কংগ্রেস সরকারের নীরব সমর্থন আর নেপথ্য পৃষ্ঠপোষকতাই দায়ী। রামের ভারতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নাটকেই কংগ্রেসের চানক্য নীতির অনুসারী ধর্ম নিরপেক্ষ নেতাদের ভূমিকা থাকে নটরাজ্যের। এবারের ঘটনাগুলোতেও নরসীমা রাও সরকারের ভূমিকা এ ঐতিহ্য বজায় রেখেছে খুবই নিপুনভাবে।

পূর্বে ঘোষণা দিয়ে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে উগ্র হিন্দুরা মসজিদ ভাঙ্গতে সক্ষম হলো কিন্তু দিল্লীর শাসকেরা কিছুই করতে পারলো না। অবশ্য নরসীমা রাও এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, ঘন কুয়াশার দরুন তার সেনাবাহিনী সময় মতো অযোধ্যায় পৌছতে পারেনি। কংগ্রেসী বৃদ্ধের কি অদ্ভুত রসিকতা। কত চমৎকার তার ব্যাখ্যা প্রদানের শক্তি! সারা বিশ্বের নিন্দা ও ধিক্কারের মুখে, ভারতীয় পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রবল আপত্তির তোড়ে, সর্বোপরি ভারতবাসী ২৪ কোটি মুসলমানের পবর্তপ্রমাণ ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড়ে দিল্লী শাহী জামে মসজিদের পরম শ্রদ্ধাভাজন খতীব ইমাম আবদুল্লাহ বোখারীর জঙ্গী ভূমিকার ভয়ে কংগ্রেস নেতা বাবরী মসজিদ পুননির্মাণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ঠিক যেমন তার পূর্বসূরীরা, কংগ্রেসের কর্ণধারেরা, নেহেরু পরিবারের ব্রাহ্মণ্যসন্তানেরা অঙ্গীকার করেছিলেন কাশ্মীরের বেলায় জাতিসংঘ প্রস্তাব বাস্তবায়নের। এদের অঙ্গীকার কখনো বাস্তবে রূপায়িতহয়নি। বাবরী মসজিদের ব্যাপারেও হবে বলে আশা করা যায় না। অন্যরা কি ভাবছেন জানিনা। তবে আমরা অন্ততঃ ভারত সরকারের কোন অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করার ভরসা পাই না।

শুধু কি হিন্দুরাই ক্ষেপে উঠেছে? নতুন বছরটি সামনে রেখে তো ইহুদীরাও দারুন বিকারগ্রস্ত হয়ে মাঠে নেমে পড়লো। গত ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলোতে ইসরাঈলের দখলদার ইহুদী সরকার, অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে যে চার শতাধিক মুসলিম মুজাহিদকে লেবানন সীমান্তবর্তী নো মেনস ল্যাণ্ডে পুশ-ইন করলো, এটা কি ইহুদীদের মাসি ভাই পৌত্তলিকদের তথাকথিত পুশব্যাকেরই অনুশীলন নয়? বাংলাভাষা ভাষী ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে হিন্দুরা যেমন মজা করে থাকে, ইহুদীরাও কি ফিলিস্তিনী আবরদের গলা ধাক্কা দিয়ে তাদেরই স্বদেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে মজা পাচ্ছে?

ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীত, তুষারপাত ও হাড় কাপানো শত্য প্রবাহের মুখে পুশ-ইন কৃত ফিলিস্তীনীরা মরে গেলেও নাকি ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনের মোটেও কষ্ট বোধ হবে না। সংবাদ সংস্থা সূত্রে ইহুদী নেতার এ সত্য কথাটি প্রচারিত হলেও "বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় বা সাম্প্রদায়িক শক্তির ছত্রছায়ায় ভারতীয় পুলিশের নির্যাতনে নিহত সহস্রাধিক বনী আদমের মর্মান্তিক মৃত্যুতে নরসীমা রাও এর অন্তরে বিন্দুমাত্র ব্যথাও অনুভূত হয়নি"-- এ সত্যটি এখনো কোন বাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পৌত্তলিক হিন্দুরা কি তবে ইহুদীদেরও পেছনে ফেলে দিলো?

এটি কোন প্রশ্ন নয়। এ হলো একটি মহাসত্যের পূনরোচ্চারণ মাত্র। মহান রাব্বুল আলামীন বহুযুগ পূর্বেই ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী শত্রুতাভাবাপন্ন মানুষ হলো ইহুদী এবং অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা।"

অতএব ইহুদীবাদী ইসরাইল ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের ভূমিকায় আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। প্রয়োজন কেবল চিন্তার, সচেতনতার, প্রস্তুতির, উত্থানের এবং তৎপরতার। আল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলমানকে নতুন শক্তিতে সমৃদ্ধ করুন। সকল অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাংখিত মুহূর্তটি ধীরলয়ে ঘনিয়ে আসুক।

নিয়মাবলী

- ইসলামী আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী নয় এমন যে কোন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি গৃহীত হবে। তবে মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদরত এবং যে কোন দেশের মযলূম ও নিগৃহীত মুসলমানদের ওপর তথ্যপূর্ণ, পর্যালোচনামূলক ও গবেষণালব্ধ লেখা প্রাধান্য পাবে।
- কাগজের এক পিঠে পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।
- কোন লেখা ছয় মাসের মধ্যে ছাপা না হলে তা অমনোনীত বলে বুঝতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাতে হবে।

গ্রাহকঃ

- বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক হওয়া যায় না।
- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে 'জাগো মুজাহিদ' প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকা ডাক যোগে পাঠান হয়।

গ্রাহক চাঁদাঃ

- প্রতি সংখ্যা সডাক ৭·০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার দাম ভিন্ন।
- ষান্মাসিক– ৪২·০০ টাকা
- বার্ষিক– ৮৪·০০ টাকা

এজেন্টঃ

- পাঁচ কপির কম এজেন্ট করা হয় না। ৩০% কমিশন দেয়া হয়।
- শতকরা ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পর্কে পূর্বে অবহিত করলে ভি, পি, যোগে তা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ কভার	৫০০০/– টাকা
২য় কভার	৩০০০/– "
৩য় কভার	২৫০০/– "
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০০/– "
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০/– "
ভিতরের এক–চতুর্থ পৃষ্ঠা	৩৫০/– "

চেক, ড্রাফট ও মানি অর্ডার পাঠানোর ঠিকানাঃ

সম্পাদক, মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা–১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯

মধ্যপ্রাচ্যসহ যে কোন দেশের ভিসার প্রসেসিং দ্রুত করার নিশ্চয়তা আমাদের অঙ্গীকার

ফমিরা ওভারসীজ
FAMIRA OVERSEAS

Recruiting Licence No.-RL-F-178
Phone Off-243561, 281067, 243567, 237346 Res. 418021
Tlx-632162 CONTL JB FAX-880-2-863379, 863170, 863317, 405853
8/2 Purana Paltan, North-South Road, Dhaka-1000

ইসলামী জিহাদের মাইল ফলক জঙ্গে মানজিকার্ট

— লেঃ কর্ণেল এম, এম, কোরায়শী —

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রোমেনাস অবশ্যই একজন সাহসী এবং অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন উগ্র স্বভাবের। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি পদাতিক সেনাদের হেয়প্রতিপন্ন করে ভুল করেছেন, দুর্বল করে দিয়েছেন রোমান শক্তিকে। আরমেনিয়া অঞ্চলের আখলাতেই ছিল সেলজুকদের সর্বশেষ ঘাঁটি। সেই ঘাঁটি দখল করার জন্য তিনি তার পদাতিক সেনাদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আরমেনিয়া থেকে পদাতিক সেনাদের মানকিজার্ট ডেকে পাঠান। কিন্তু তাদের যুদ্ধের ময়দানে আসার পূর্বেই আল্প-আরসালান তার বাহিনীসহ রোমেনাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়েই রোমেনাস সেলজুকদের মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়।

ঝানু দাবা খেলোয়াড়রা যেমন চমৎকার নৈপুণ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে বসে, রোমেনাস এবং আল্প-আরসালানও তেমনি অসম সাহসিকতা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কখন কিভাবে যুদ্ধ করতে হয় তারা তা জানতেন। তারা জানতেন পরস্পরের কলা-কৌশল, সামর্থ এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। দাবা খেলায় খেলোয়াড়ের ব্যক্তিত্ব যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানে অধিনায়কের ওপর যুদ্ধের ফলাফল অনেকখানি নির্ভরশীল। রোমেনাস অন্যায়ভাবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। সর্বোপরি, সম্রাট কনস্টানটাইনের বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে রাজদণ্ড গ্রহণ ও কনস্টানটাইনের নাবালক পুত্র মাইকেল-এর অভিভাবক এবং সহযোগী হিসেবে রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেন। রোমেনাস যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেছেন, দেশে আরও অনেকের সেভাবে রাজদণ্ড গ্রহণ করার মত যোগ্যতা ছিল। ফলে অন্যান্য যোগ্য যুবরাজরা তাকে অবজ্ঞা এবং ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। সেকারণেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার জন্য প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করা তার জন্য জরুরী ছিল। রোমেনাস ভালভাবেই জানতেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে তার সুখ-স্বপ্নেও হয়ত নেমে আসবে বিপর্যয়। ফলে সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই তাকে অবিরাম সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই কেটে যায় তার তিনটি বছর।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে আল্প-আরসালানের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর এ ধরণের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ইসলামের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আব্বাসীয় খলিফা তার চাচা তুঘরিলের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেলজুকদের একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণেই আব্বাসীয় খিলাফতের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আল্প-আরসালান এত দ্রুতগতিতে মানজিকার্টের ময়দানে হাযির হন যে, রোমেনাস তার পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অবকাশ পায়নি। রোমেনাসের বিরুদ্ধে আল্প-আরসালানের এটাই ছিল প্রথম বিজয়। তাছাড়া বড় রকমের বিজয় অর্জনের কোন পরিকল্পনা নিয়ে আল্প-আরসালান যুদ্ধের মাঠে আসেন নি। আর্মেনিয়া সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে উত্তর সিরিয়ার বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আর্মেনীয় সীমান্তকে বিপদমুক্ত করার জন্য মানজিকার্টে ছুটে আসেন। যুদ্ধের ময়দানে এসেই তিনি শান্তির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রোমেনাসের চিন্তা ভাবনা ছিল অন্যরকম। রাজধানী থেকে যুদ্ধযাত্রার সময় থেকেই তিনি অনেক উচ্চাবাচ্য করেন, নানাভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করার চেষ্টা করেন। নিজের মান-সম্মানের খাতিরেই বড় রকমের একটি বিজয় খুবই জরুরী ছিল। বিশেষ করে আল্প-আরসালানের বাহিনীর সংখ্যা স্বল্পতা দেখে তাঁর সে আশা আরও বেড়ে যায়। এ ধরণের একটি সহজ বিজয়কে তিনি কোনভাবেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না। সুতরাং তিনি অত্যন্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে আল্প-আরসালানের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আপোষ প্রস্তাব বিফলে যাওয়ায় আল্প-আরসালান যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সংখার বিচারে তাঁর বাহিনী ছোট হলেও, সেলজুক অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা ছিল ভীষণ চঞ্চল ও চতুর। তারা ঘোড়ায় চড়ে শত্রু শিবিরে আক্রমণ চালায়। অবিরামগতিতে তীর-বৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং শত্রু সীমানার মধ্যে না গিয়ে পরক্ষণেই নিরাপদ দূরত্বে সরে আসে। রোমান বাহিনীতে বেসিলে সিয়াছ নামের একজন গভর্ণর ছিল। সেলজুক তীরন্দাজদের এ ধরণের আক্রমণের জন্য তিনি ভীষণভাবে উত্তেজিত হন। তড়িঘড়ি করে একটি বাহিনীগঠন করে সে তুর্কীদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দ্রুতগতি সম্পন্ন সেলজুক অশ্বারোহীরা পেছনের দিকে সরে যায়। ভারী রোমান অশ্বারোহীরা তবু থামল না। তারাও তুর্কীদের পিছু ধাওয়া করে। এভাবে মাইল কয়েক যাওয়ার পর হঠাৎ করেই বিসিলেসিয়াস দেখতে পেল যে অশ্বারোহী

ঈগলপাখেরা ছুটছে না, লড়ছে না। তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। ছুটোছুটি করিয়ে দিয়ে সে অশ্বারোহী সেনাদের গুছিয়ে নিল। তৈরী হল তৃতীয় আক্রমণের জন্য। বেসিলে নিরাশ এবং তার বাহিনীর যেন আর বিলম্ব সইছিল না। তাদের যেন কি এক উন্মাদনায় পেয়ে বসল। আক্রমণের জন্য তারা ছটফট করে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। চারিদিক থেকে রোমান অশ্বারোহীদের ওপর তীর-বৃষ্টি শুরু হয়। তীরগুলো যেন নিখুঁতভাবে বেয়ে বেয়ে অশ্বারোহীদের গায়ে বিঁধতে থাকে। সম্রাট রোমেনাস সহজেই বেসিলিয়াসের অবস্থা অনুধাবন করতে পারেন। বিলম্ব না করে তাকে সাহায্য করার জন্য একটি উদ্ধারকারী দল পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অতঃপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারা ফিরে যেতে যে রোমানরা যেখানে ছিল পেছে বসেছিল, তা একটা শবশয্যায় পরিণত হয়েছে। মৃত ঘোড়া এবং নিহত সৈনিকেরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। একটি উদ্ধারকারী দলও অব্যাহতি পেল না। তারাও সেলজুকদের আক্রমণের শীকার হল। বিপুল ক্ষতিতে স্বীকার করে ফিরে আসতে হল মূল ঘাঁটিতে। এটা ছিল মানজিকার্টের যুদ্ধের অন্তিম-অধ্যায়ের দ্বিতীয় বিজয়।

পরদিন প্রত্যুষে রোমেনাস তার বাহিনীকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে সাজালেন। বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের সাথে সেনা ছাউনির নিবিড় সংযোগ রাখার ব্যবস্থা রাখলেন। ফোকাডেসিয়াস, আর্মেনিয়াস এবং চার্টনিয়ানস-এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল রোমান বাহিনীর দক্ষিণ প্রান্ত। বাম প্রান্তে ছিল ইংরেজীয় সেনারা। মধ্যভাগে ছিল তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং রাজধানী অঞ্চলের সৈনিকেরা। এই বাহিনীর নেতৃত্ব নিলেন রোমেনাস নিজে। পশ্চাদ্ভাগে ছিল অশ্বারোহী, যেতনজোয়ী জার্মান ও নরম্যান সৈনিকেরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পূর্ব দিগন্তে অধিষ্ঠিত সেনারা। চিটিকাসকে নিয়োগ করা হল এই বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে। বলা বাহুল্য, একজন যোগ্য সেনাপরিচালক হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে বিরাট একটি অর্ধচন্দ্রের আকারে অবস্থান নিল। সুলতান আলপ-আরসালান দাঁড়ালেন সবার মাঝখানে। সেলজুকদের যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তারা রোমান সেনাদের বিভিন্ন স্থানের ওপর অবিরাম তীর ছুড়তে শুরু করল। শত্রু সেনারা দুর্বল সংগঠনের মধ্যে পড়ে যায়। একটি সুযোগের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু আক্রমণের জন্য তেমন কোন সুযোগ তারা পেল না। আসলে রোমান বাহিনীতে হালকা অশ্বারোহী এবং খণ্ড যুদ্ধ করার মত পর্যাপ্ত সেনা ছিল না। ফলে সেলজুকরা একতরফাভাবে তীর বৃষ্টি অব্যাহত রাখল। অত্যন্ত নির্মম এবং অসহায়ভাবেই মারা গেল রোমান সৈনিকেরা। নিহত হল তাদের ঘোড়াগুলো। রোমেনাস এবং তার বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে এইসময় যুদ্ধ অবলোকন করল। বুঝল যে এভাবে সেলজুকদের মোকাবিলা করা কঠিন। এটা অসম্ভব। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রোমেনাস ছোটো বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রোমানদের গতিবিধি সম্পর্কে তুর্কীরাও ছিল সচেতন। রোমানদের এগিয়ে আসতে দেখেই তুর্কীরা অত্যন্ত সুচতুরভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে পেছনের দিকে সরে যায়। কিন্তু তারা তীর-বৃষ্টি অব্যাহত রাখে এবং রোমান বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তারা রোমানদের তাড়া অশ্বারোহীদের তখনও পাল্টা আক্রমণ চালানোর মত কাছাকাছি আসতে দেয়নি। অবশেষে নিজেরাও একটা পেছনে সরে যায়নি যাতে করে রোমান বাহিনী তাদের আক্রমণ নীরব বাইরে চলে যায়। এমনি সন্দিগ্ধ এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খলিত এবং নিপুণ দু'টি বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এগিয়ে যায় মানজিকার্টের বিশাল বিস্তৃত সমতল ভূমির দিকে। রোমানদের প্রতি অশ্বারোহীরা এক সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। দিগন্তরেখা ধূলা শুকিয়ে আসে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে থাকে। ঘোড়া থেকে নেমে আসে এবং সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার পথ ধরে।

রোমানরা পশ্চাদপসরণ শুরু করার সাথে সাথেই তাদের উৎসাহ নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সারা দিনব্যাপী এই বিপর্যয় যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যে অশ্বারোহী তীরন্দাজরা একক্ষণ পেছনের দিকে সরে যাচ্ছিল, এবার তারা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অবিরাম তীর বর্ষণ করে রোমানদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সম্ভবত রোমানদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। একই সময়ে তিনি সময় যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাহার করতে পারেননি। অন্যদিকে সেনাদের কাছে সর্বপ্রথম সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পৌঁছে এবং তদনুসারে তারা প্রত্যাবর্তনের কাজ শুরু করে। প্রত্যুষে এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদের কাছে রোমেনাসের নির্দেশ অনেক পরে পৌঁছে। ফলে শুরুতে তারা অন্যান্যদের সেনাদের গতিবিধি বুঝে উঠতে পারেনি। যখন তারা রোমানদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং খুবই এলোমেলো এবং বিশৃঙ্খলভাবে তারা ফেরা শুরু করে।

তুর্কীরা সুযোগের সন্ধানে ছিল। সেনাবাহিনীর আগে-পিছে প্রত্যাবর্তনের কাজ শুরু করার আগে বিভিন্ন সারির মধ্যে বেশ ফাঁক সৃষ্টি হয়। তুর্কী তীরন্দাজরা অতর্কিত এই মুহূর্ত স্থানে আঘাত হানে। রোমানরা এবার মরবড় সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে রোমেনাস তুর্কী তীরন্দাজদের এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে অবস্থানগতভাবেও রোমান বাহিনীকে পর পর কয়েকটি গরমিল দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের কাজ আরো পিছে চলে হওয়ার কারণে চিটিকাসের নেতৃত্বাধীন পশ্চাদ্ভাগ বাহিনীর সবার আগে শিবিরে পৌঁছার কথা, তারা পড়ে যায় সবার পেছনে।

আবার মূল অগ্রবর্তী বাহিনী যাদের সবার পরে শিবিরে পৌঁছার কথা, তারা চলে যায় সবার সামনে। প্রত্যাবর্তনের পথে নতুন করে তুর্কীদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ডিউকাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী এবার অগ্রবর্তী বাহিনীর অবস্থানে চলে আসে। কিন্তু তুর্কীদের মোকাবিলার খবর সময়মত তার কাছে পৌঁছায়নি ফলে ডিউকাস যেভাবে শিবিরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, এখনও সেভাবে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে।

এভাবে ডিউকাসের প্রত্যবর্তন প্রসঙ্গ নিয়ে বহু তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রোমান ঐতিহাসিকদের মতে এটা ছিল ডিউকাসের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ এবং জেনে-শুনেই সে এমনটি করেছিল। আসলেও কি রোমান ঐতিহাসিকদের এই অভিযোগকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায়? নাকি ডিউকাসের কাছে সময় মত সিদ্ধান্তের খবর না পৌঁছার কারণেই এমনটি হয়েছিল? সম্ভবত শেষোক্ত অনুমানটি সত্য। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে রোমানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল এবং অনুন্নত। শিবিরে প্রত্যাবর্তনকালে রোমান বাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা এবং গরমিল দেখা দিয়েছিল, তা থেকেই রোমানদের এই দুর্বলতার নজির মেলে। সকল অধিনায়কের সময়মত সিদ্ধান্তের কথা জানাতে না পারার কারণে রোমেনাস মুল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অগ্রবর্তী বা পশ্চাদবর্তী দল বলে কিছু থাকল না। তুর্কী সেনারাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। অতর্কিতে তারা রোমান বাহিনীর প্রান্তভাগের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে রোমান সেনাদেরকে। বাম প্রান্তের সেনাদের কাছেও তুর্কীদের মোকাবেলা করার সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছায়নি। ফলে তারাও প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেল না। তারা মুল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু তারা এককভাবে তুর্কীদের মোকাবিলা করল। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস বিফলে গেল। অল্পতেই হার মানল তুর্কীদের কাছে। তুর্কীরা যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল। অনুরূপভাবে তুর্কীরা রোমান বাহিনীর ডান প্রান্তের সৈন্যদেরকেও তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং নির্মূল করে দিল সম্পূর্ণভাবে। তুর্কী সেনারা এবার রোমান বাহিনীর মধ্যভাগের ওপর দৃষ্টি দিল। রোমেনাস নিজে এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তুর্কীরা চার দিক থেকে এই দলকে ঘিরে ফেলছিল। রোমেনাসের নেতৃত্বে তারা যে প্রতিরোধটুকু গড়ে তুলেছিল, তুর্কীদের দুর্বার আক্রমণের মুখে তাও ভেঙ্গে-চুরে খান খান হয়ে গেল। তুর্কীদের হাতে হতাহত হয় অনেকে সেনাপতি। রোমেনাসের ঘোড়াটিও নিহত হল। তিনি নিজে আহত হন। বন্দী হলেন তুর্কীদের হাতে। বন্দী হল আরও অনেক। রোমেনাসের নেতৃত্বাধীন মধ্যভাগের একটি লোকও পালিয়ে যেতে পারল না। হয় তারা তুর্কীদের হাতে বন্দী হল, নয়ত মারা গেল তলোয়ারের নিষ্ঠুর আঘাতে। অল্প সময়ের মধ্যেই মানজিকার্টের ময়দান দিয়ে বয়ে গেল রক্তের বন্যা। এমনি করুণ পরিণতির মধ্য দিয়েই ভারী অশ্বারোহী তীরন্দাজদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটল। পর্যুদস্ত হল রোমেনাসের শক্তিশালী রোমান বাহিনী। চূড়ান্ত যুদ্ধের এই দিনটি ছিল ১০৭১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট।

আমরা যাদের উত্তরসূরী

(২৮পৃঃ পর)

বিভক্তির পূর্বে জাতীয় এবং প্রাদেশিক এসেম্বেলি ইলেকশনে মাওলানা উসমানীর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। ইলেকশনের সময় নবাব জাদা লিয়াকত আলী ছিলো জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের খ্যাতনামা নেতা। মুহাম্মদ আহমাদ কাজেমীর ও কংগ্রেসের সাথে খুব ভাব ছিল। নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ রাজনীতিবিদদের সাথেও ছিল ভাল সম্পর্ক। ইলেকশনের প্রচারণা তখন তুঙ্গে। আল্লামা উসমানী তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন। মাঠে, ময়দানে, গ্রামে-গঞ্জে মানুষকে মুসলিম লীগের বাক্সে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সারা ভারতে মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য তিনি প্রজ্জলিত করেন ত্যাগের মশাল। ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার জন্য মুসলিম যুবকেরা বলতো, "সিনে মে গুলি খায়েং আওর পাকিস্তান বানায়েংগে।" যাহোক সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল যখন দেখা গেল কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগ ২১২ ভোট বেশী পেয়ে নবাব যাদা লিয়াকত আলী খান নির্বাচিত হন। চারিদিকে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। এসব সফলতার মুলে ছিল আল্লামা উসমানীর ঐকান্তিক সাধনা ও মেহনত।

পাকিস্তানের পথেঃ আল্লামা উসমাণী ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পূর্বেই পাকিস্তানে হিজরত করেন। শাসনতন্ত্র প্রনয়ন কমিটির তিনি সভাপতি নিযুক্ত হন এবং শাসনতন্ত্র এসেম্বেলিরও সদস্য মনোনীত হন। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি পাকিস্তানে বহু দ্বীনি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক খেদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট করাচীতে তিনিই প্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তান সরকারের উপর তার বিরাট প্রভাব ছিল। তাকে একজন ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে সাথে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবেও গণ্য করা হতো।

ইন্তেকালঃ পাকিস্তানের জামেয়া আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুর একটি প্রাচীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। ভাওয়ালপুর রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জামেয়ায় উন্নতিকল্পে মাওলানা উসমানীকে দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং ভাওয়ালপুর উপস্থিত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে মাত্র। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক ঘন্টা অসুস্থ পর ১৯৪৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ভাওয়ালপুর থেকে জানাযার পর তার লাশ করাচীতে আনা হয় এবং মুহাম্মদ আলী রোডের নিকটে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে?

= আব্দুল্লাহ আল-ফারুক =

একটি মসজিদের সাহাদাতঃ অব্যক্ত বেদনায় গুমরে কাদছে এককালের ভারতের দোর্দন্ড প্রতাপশালী, মর্দে মুজাহিদ মোঘল সম্রাট বাবরের পবিত্র আত্মা। তার শান্তির নিদ ভেঙ্গে গেছে ভারতের উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার গজিয়ে ওঠা শিং-এর হিংস্র আঘাতে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাবরী মসজিদের আর্তনাদে। বিশ্বের মর্মাহত কোটি কোটি মুসলমানের বেদনায় তিনিও হয়েছেন বেদনার্ত। উগ্র হিন্দুদের মসজিদের ওপর কুঠার, শাবল চালানোর আঘাত তার হৃদয়কেও করেছে বিদীর্ণ। পশুর মত হিংস্র মানুষগুলো অপবিত্র পাদুকা দ্বারা দলিত করে পবিত্রমসজিদ গাহ অপবিত্র করণে তাঁর প্রাণ হাহাকার করছে। বাবরী মসজিদের অস্তিত্বকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ায় তার আত্মা আজ শোকাহত।

বাবরী মসজিদ, ইট, পাথর, চুন, সুরকির নির্মিত নিছক কোন ইমারত নয়, বিশ্বের লাখো মসজিদের ন্যায় এই মসজিদের সাথেও মুসলিম জাতির ঈমান, ইজ্জৎ, বীরত্ব ও গৌরবময় ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। এই পবিত্র ঘরের মাধ্যমেই বান্দা তার পরম করুণাময়ের সঙ্গ লাভ করে। এই ঘর মুসলিম জাতির আত্ম মর্যাদার প্রতীক। এই ঘর আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের উপঢৌকন, মুসলিম জাতির উথান-পতনের সুস্পষ্ট নিদর্শন, বদর, ওহুদ যুদ্ধের ফলাফল এই পবিত্র ঘর। যাদের পদভারে এককালে এই পৃথিবী থর থর করে কম্পমান হত সেই উমর, খালিদ, তারিক, কাসিমের উত্তরসূরীরা যুগে যুগে এই পবিত্র ঘরে সেজদায় মাথা অবনত করেছেন। এই ঘর থেকেই মুয়াজ্জিন আল্লাহ্‌র এবং মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। আজ সেই লাখো মসজিদের একটি বাবরী মসজিদের অস্তিত্ব অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বিলীন করে দেয়া হয়েছে। সম্রাট বাবরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মীর বাকী সম্রাটের স্মরণার্থে অযোধ্যায় এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ জন্যই এই মসজিদের নামের সাথে সম্রাট বাবরের নাম বিজড়িত। আজ সে মসজিদ ইতিহাসের পাতায় থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। মসজিদের স্থানে পূজিত হচ্ছে রামের মনুষ্যনির্মিত কল্পিত অবয়ব। মসজিদ আজ মন্দিরে রূপান্তরিত হওয়ার পথে প্রায়।

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হঠাৎ বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের ওপর ইসলাম বিরোধীরা যে আগ্রাসন চালাচ্ছে, মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার যে কোশেশ চলছে, বাবরী মসজিদ ধ্বংস কাণ্ড সেই নীল নকশার একটা অংশমাত্র। বিশ্বকে মুসলিম শূন্য করার নীল নকশার আওতায় মুসল-মানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে এবং ইহুদীদের কুক্ষিগত রাখা হয়েছে। বোখারার বিখ্যাত জামে মসজিদকে সরাইখানায় পরিণত করা হয়েছিল, আকিয়াবের বিখ্যাত জেটি জামে মসজিদকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, বসনিয়ার অসংখ্য মসজিদ বিরান করে দেয়া হয়েছে। গ্রানাডার ও কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ সমুহ সেই চক্রান্তের জন্যই গত ৫০০ বছর ধরে কালের সাক্ষী হিসেবে বিরাণ দাড়িয়ে আছে। বাবরী মসজিদের পরিণতি তারই নব সংযোজন।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় ১৯৯১ সালে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা "র"-এর একটি দল বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের স্পেনের স্টাইলে বিতাড়নের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে স্পেনে যায়। ঐ খবরে আরও জানা যায়, স্পেন থেকে আটশত বছরের শাসক জাতিকে চিরতরে উৎখাত করণের ব্যাপারে মূল পরিকল্পনা, সুদূর প্রসারী কর্মসূচী ও সফল বাস্তবায়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান হাসিলের জন্য "র" এর এই বিশেষজ্ঞ দলটি স্পেনের খৃষ্টান পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। বর্তমানে তারা স্বদেশে তাদের লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগেরত আছেন। বাবরী মসজিদ যেভাবে সামরিক অপারেশনের কায়দায় দক্ষতার সাথে ভাঙ্গা হয়েছে এর পেছনে সেই দলটির যে হাত আছে তা নির্দিষ্ট করে বলতে দ্বিতীয় কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উত্থানের নেপথ্যেঃ

উপমহাদেশে মুসলিম জাতির আগমন ও বিস্তার লাভের পর প্রায় এক হাজার বছর ধরে তারা এখানে রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। আঠারো শতকের শেষভাগে মুসল-মান শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজ এ দেশের ক্ষমতা দখল করে। এই বেনিয়ার জাত বুঝতে পারে, স্বাভাবিক ভাবে তারা এই দেশে বেশি দিন শোষণ চালাতে পারবে না। তাই "ডিভাইড এণ্ড রুল্‌স" পলিসি মাফিক হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে সুকৌশলে শত্রুতার বীজ বপন করে। তারা বুঝেছিল, ভারতবাসীকে অন্ধকারে রাখতে হলে ইতিহাসে ভেজাল দিতে হবে এবং এই ইতিহাসে ভেঝাল দেয়ার মাধ্য-মেই হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে। ইংরেজ পণ্ডিতগণ নিজেদের লেখা বই ছাড়াও মুসলিম লেখকদের মূল লেখার

অনুবাদ করতে গিয়ে অত্যন্ত নিপূণতার সাথে ভেজাল মিশিয়েছেন। কোন কোন স্থানে রূপকথার ন্যায় গল্প জুড়ে দিয়ে তা ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সব "অপদার্থ মার্কা" বই এর অবলম্বনে পরবর্তিতে ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র ভারতব্যাপী ক্যান্সার ব্যধির মত দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। এই ইতিহাস বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারত বর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দেই তা' ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক দুঃস্বপ্নের কাহিনী মাত্র।" [চেপে রাখা ইতিহাস]

আনন্দবাজার, যুগান্তর ও বসুমতীর প্রশংসিত গ্রন্থ 'বাংলা ও বাংগালীর ইতি-হাসে'র প্রথম খণ্ডে শ্রী ধনঞ্জয় দাস মজুমদার লিখেছেন, "ইংরেজগণ তখন শাসক জাতি ছিলো। ভারত শাসনের সুবিধার জন্য তাহারা হিন্দু শাস্ত্রের বহু তথ্য গোপন, বহু তথ্য বিকৃত এবং বহু মিথ্যা প্রক্ষিপ্ত করিয়া যে মিথ্যা ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার বহু প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু-মুসলিম বিবেধের সুযোগে ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য তাহারা তাহাদের নবাগত হিন্দুদিগকে এইরূপ মিথ্যা ইতিহাস লিখিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। [পৃঃ ৬৬-৬৭, চেপে রাখা ইতিহাস]

এই সব প্রচলিত ইতিহাস দ্বারা শেখানো হয়েছে যে, মুসলমানরা বহিঃভারত থেকে এসে এদেশ দখল করে নিয়েছিল। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল হাতি, ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র। তারা আক্রমণকারী, বিদেশী, লুণ্ঠনকারী, ভারতীয়দের হত্যাকারী, হিন্দুদের মন্দির ধ্বংসকারী এবং তারা হিন্দুদেরকে জোর করে মুসলমান বানিয়েছিলো ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী কলম-বাজদের কলম দ্বারা লিখিত হলো, 'মোঘল সম্রাট বাবরও ছিলন একজন লুণ্ঠনকারী ডাকাত। তিনি এদেশে লুণ্ঠন করতে এসে রাম জন্মভূমির মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করেছেন।'

এই ইংরেজ শাসনামলেই একজন ইংরেজ লেখিকা এনেট সুসান বেভারেজ "বারব নামার' অনুবাদ শেষে মন্তব্য জুড়ে দেনঃ,

"বাবর একজন মুসলিম হিসেবে এবং হিন্দু মন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্ভবত মন্দিরের একটা অংশ ভেঙ্গে ফেলে মসজিদ তৈরী করেছেন। মুহম্মদের একজন আজ্ঞাবাহী অনুগামী হওয়ার ফলে বাবর অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাই তাঁর কাছে মন্দিরকে অপসারিত করে একটি মসজিদ তৈরী করাটা কর্তব্যপূর্ণ এবং যোগ্য কাজ ছিল।"

ব্যাস, ইতিহাস, স্থাপত্য, যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ না থাকলেও লেখিকার এই নিজস্ব কল্পনা এবং "সম্ভবত একটা অংশ ভেঙ্গে ফেলা "কথাকে অবলম্বন করে বাবরী মসজিদ আজ ধ্বংস্তুপে পরিণত।

তবে বাবর যে উপমহাদেশে স্ব-ইচ্ছায় আসেননি, বরং উপমহাদেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্তের একটা অংশহিসেবে যে তাঁকে হিন্দুরাই আহবান করে এনেছিলো তা' নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের লেখার দ্বারা প্রমাণিত।

দিল্লীতে তখন লোদি বংশের সূর্য অস্ত যায় যায় অবস্থা। অবর্ণ মেবারের রাণা সংঘ একে হিন্দু রাজত্ব কায়েমের স্বর্ণ সুযোগ বলে মনে করে। কিন্তু তার ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সাহস ছিল না। তাই কাটা দিয়ে কাটা তোলার খেলায় তিনি সুদূর ফারগানার আমীর বাবরকে আমন্ত্রণ জানান দিল্লী আক্রমণের।সতর্ক এবং কৌশলী রাজনীতিবিদ বাবর দিল্লী দখল করার পর রাণা সংঘের কুমতলব টের পেয়ে যান। তাই উপমহাদেশে মুসলিম স্বার্থের বিপদ বুঝতে পেরে তিনি সাহসিকতার সাথে রাণা সংঘের মোকবিলা করে রাম রাজত্ব কায়েমের পথ রুদ্ধ করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নির্লজ্জের মত বাবরের ওপর ভারত আক্রমণকারী ও মন্দির ভাঙ্গার অপবাদ আরোপ করে।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের প্রচেষ্টায় নয় বরং অসংখ্য সুফি দরবেশ, পীর-আউলিয়াদের প্রচেষ্টায়ই যে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল সে ব্যাপারে এখন আর কোন মতভেদের অবকাশ নেই। উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মাজার তারই প্রমাণ। জোর-জুলুম করে ইসলাম প্রচার করা হলে এই সব মহাপুরুষকে মসুলমানদের সম হিন্দুদেরও ভক্তি করার কোন যুক্তি থাকে না। তাছাড়া ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি দ্বীপে কোন সৈন্য বাহিনী বা রাজা-বাদশাহ সুলতান অভিযানে আসেনি। অথচ সেখানে এখন মুসলমানে ভরপুর। ইন্দোনেশিয়ার শতকরা ৯০ জন এবং বোর্নিও দ্বীপের ১০০%ই মুসলমান। আসল সত্য হল, উপমহাদেশের মুসলিম শাসকেরা ধর্ম প্রচারের অপেক্ষা রাজ্য শাসন নিয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলেন বলে দীর্ঘ এক হাজার বছর যাবৎ তাদের শাসন চলার পরও উপমহাদেশের বৃহত্ত এলাকা ভারতর লোকসংখ্যার মাত্র ১৫% মুসলমান। মুসলিম শাসকেরা যদি হিন্দু ধর্ম বিলোপ সাধনে বা জোর করে তাদের মুসলমান বানানোর চেষ্টা করত তবে কমপক্ষে মুস-লিম শক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলির অধিবাসীরা অবশ্যই হিন্দু থাকত না। দেশটিতে দীর্ঘ সময় পরে ৮০ কোটি কেন মুসলমানদের পরিবর্তে দেশ শাসন করার মত একজন হিন্দুও খুঁজে পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা উদারতার সাথে দেশ শাসন করেছেন কারও ধর্মের ওপর আঘাত করেননি। কারও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাঁধার সৃষ্টি করেননি।

ইতিহাস বিকৃতির এই পথ ধরে ভারতের উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন আরএসএস, বিজেপি, বজরংঘ, বিশ্ব হিন্দু

পরিষদ প্রভৃতি দাবী করল যে, তাদের আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্র ঠিক আজকের অযোধ্যার যেখানে বাবরী মসজিদ রয়েছে সেখানেই জন্ম নিয়েছিলেন এবং ঐখানে একটি রাম মন্দিরও ছিল। তাদের এর স্বপক্ষে একমাত্র প্রমাণ হল ইংরেজ লেখিকা বেভারেজের দেয়া নিজস্ব অলীক মতামত। ভারতের অগণন অমুসলিম ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববীদ ও মনীষী যুক্তি-প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন যে, রামচন্দ্র একটি কাল্পনিক চরিত্র, বাস্তবের সাথে তার কোন মিল নেই। তাছাড়া আজকের অযোধ্যার সাথে রামায়নে বর্ণিত সে অযোধ্যারও কোন মিল নেই। কিন্তু সাম্প্রাদায়িকতা ও উগ্রতা যুক্তি প্রমাণের কোন ধার ধারেনা। ভারতের প্রাত্ন তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামলা থাপরসহ ২৫ জন ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, 'বাবরী মসজিদের সাথে রাম মন্দীরের সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা নেই। মসজিদের যে কালো পাথর যা' সীতাকে উদ্ধারের সময় লঙ্কা থেকে আনীত বলে কথিত, সেগুলো হয়ত অন্য কোন স্থান হতে আনীত। মসজিদটি মন্দির ভেঙ্গে করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই।"

জওহারলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর হিস্টোরিকাল স্টাডিজ এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "রামের জীবনের বর্ণনা সর্বপ্রথম রামকথা প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বর্তমানে এটা মূলরূপে পাওয়া যায় না, যদিও এটাকে সামনে রেখেই বাল্মীকী "রামায়ন" নামে দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন।-যেহেতু রামায়ন একটি কাব্য সেহেতু এর মধ্যে বর্ণিত সকল পাত্র, স্থান ইত্যাদি বাল্মীকী।" [৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ]

পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ন প্রসঙ্গে বলেন, "বাল্মীকি বলে অভিহিত কোন এক কবির সৃষ্টি রামায়ন একটি সাহিত্য কীর্তি। পরবর্তিকালে এর অনেক সংযোজন ও পরিবর্তন হয়। বিপুল সংখ্যক রামায়ন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, রামায়ন একজন প্রতিভাশালী কবি। তিনি তিন বা ততোধিক লোকগাথাকে একত্রিত করে একটি সুসংবদ্ধ কাব্য কাহিনী রচনা করেছেন। এ মহাকাব্যের অন্তরালে বা পাশ্চাৎপটে কোনরূপ ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে প্রতিভাত হয় না। বর্তমান কালে ভারতীয় ইতিহাসের কোন পণ্ডিতব্যক্তিই মনে করেন না যে, রামায়নের নায়ক রামচন্দ্র কোন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন যাকে কোন বিশেষ সময়কালের বা সময়ের সীমায় বাধা যেতে পারে। [Suniti kumar chatterjee, word literature and Togore, Visva bharati, 1971, P. 48-49, quoted in sl No (9) XVII-XVIII]

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরী মসজিদ নির্মাণের সময় পরম রামভক্ত তুলসী দাসের বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি অযোধ্যায় বসেই "রামচরিত নামস" রচনা করেন। রামকে পুঁজা করার প্রথা তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করার পরই তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিশ্চয় (!) রামের জন্মস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি কোথাও রামের জন্মস্থান বা রাম মন্দির ভেঙ্গে যে মসজিদ তৈরির ঘটনা ঘটল তা' উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি এই সময়ে ইসলাম ধর্মের উথান নিয়ে বার বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহলের নিকট ইতিহাসের কোন মুল্য নেই। সত্যের কোন বালাই তাদের নেই। "রাম জনমভূমি এবং অযোধ্যায় মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করার দাবীর বিপক্ষে পাহাড় প্রমাণ ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ সত্ত্বেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা তাদের মত ও ইচ্ছাকে গায়ের জোড়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে বহুদিন থেকে। যখন তারা যুক্তি-প্রমাণ ও তথ্যের সামনে দাড়াতে পারছে না তখন ঝুলি থেকে বেড়ালটি বেড়িয়ে পড়ল। এবার বলা হয়, 'ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, প্রমাণের ব্যাপর নয়। শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোড়েই খৃষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের সন্তান বলে মেনে নেয়। শুধুমাত্র বিশ্বাসের বলেই মুসলমানরা মুহাম্মাদকে প্রেরিত নবী বলে স্বীকার করে এবং হিন্দুরাও শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোড়েই মেনে নেয় যে, অযোধ্যার রামজন্মভূমি হলো ভগবান রামের জন্ম স্থান।" [কে এস লাল অর্গানাইজার পত্রিকা, অক্টোবার ১৯৮৯]

সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, মুহাম্মদ (সাঃ) আরবে এবং যীশু খৃষ্ট (ঈসা আঃ) যে প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা বাস্তব, তাঁরা যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ এটা হলো বিশ্বাসের বিষয়। সেরকম রাম অবতার ছিল এটা হয়ত হিন্দুরা মানতে পারে কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য জন্ম ইতিহাস বা কোন বাস্তবতা ছাড়া কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ইতিহাসতো কোন বিশ্বাসের বস্তু নয়। কল্পনা ও বিশ্বাস যেমনি ইতিহাসের ব্যাপার নয়, তেমনি তথ্য-প্রমাণের ওপর ভর না করে ইতিহাস চলতে পারে না। আর যুক্তি প্রমাণ, বিজ্ঞান ও বাস্তবের সাথে মিল না থাকলে এবং সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকলে তাকে কোন গ্রহনযোগ্য ধর্ম বলা যায় না। অন্ধ বিশ্বাস বা কল্পকাহিনীকে মূর্খতা বলা যেতে পারে তাকে অবশ্যই কোন ধর্ম বলা যায় না।

মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় দায়ী কারা?

গত ১১ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও বিবিসির সংবাদদাতা মার্ক টালির সাথে এক সাক্ষাতকারে দাবী করেছেন,"বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় আমি বা আমার সরকার দায়ী নয়। এর জন্য পুরোপুরি দায়ী রাজ্য সরকার।" আসলে তার এ দাবী কতখানি সত্য? নরসিমা রাও কি ভুলে গেলেন যে, ১৯৪৯ সালে এই কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে উগ্র হিন্দুরা মসজিদে রামের মূর্তী স্থাপন করেছিল এবং ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে মসজিদটি ক্রোক করে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়, মুসলমানদের জন্য মসজিদটি

ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়? মসজিদ থেকে মূর্তিতো সরানো হয়ইনি বরং হিন্দুদের মজজিদের দরোজা থেকে দশ ফুট দুরে থেকে মূর্তী পূজো করার সুযোগ দেয়া হয়। এভাবেই কংগ্রেস সরকার আজকের সাম্প্রদায়িক রক্তা-রক্তির উদ্বোধন করেছিল। ১৯৮৬ সালে এই কংগ্রেস সরকারই ক্ষমতায় থাকাকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মসজিদের তালা খুলে এটিকে হিন্দুদের পূজো করতে উন্মুক্ত করে দেয়। মসজিদকে পরিণত করে মন্দিরে। ১৯৮৯ সালে সেই রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরী মসজিদের পাশে রাম মন্দিরের শিলা বিন্যাস করে চূড়ান্ত ভাবে হিন্দু-মুসলিম হানাহানির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। আর ১৯৯২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়। সুতরাং পুরো ঘটনার সূচনা থেকে সমাপ্তি ঘটে কংগ্রেস সরকারের আমলে। উগ্রপন্থী হিন্দুরা কখনই ক্ষমতায় ছিল না। কংগ্রেস সরকারের মদদ না পেলে বা মসজিদ রক্ষায় কংগ্রেস সরকার আন্তরিক হলে উগ্রপন্থীরা কখনো এতদূর অগ্রসর হতে পারত না বা তা সম্ভবও নয়। তা যদি হতো তবে কংগ্রেস সরকার অবশ্যই ক্ষমতা থেকে সরে দাড়াতো। তিনি কিভাবে কংগ্রেস সমরকারকে এ ব্যাপারে নির্দোষ দাবী করতে পারলেন? মসজিদ ভাঙ্গার জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও দায়ী নন এটাও তার একটা হস্যাকর ও ছেলে ভুলানো কথা। কেননা তিনি ভালভাবেই জানেন, ১৯৯১ এর নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে বিজেপি বিজয় লাভ করার পর রাজ্য সরকার কল্যাণ সিং পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, 'আজ রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের সকল বাধা দূর হয়েছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে, এখন আমাদের মন্দির নির্মাণে বাধা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের কাজে বাধা দেয় তবে তার পরিণতিও পূর্বেকার সরকারের মত হবে।"

ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার ঢাকার একটি দৈনিকে স্বনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সিবিআই' মসজিদ ভাঙ্গার পাঁচ দিন পূর্বেই প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছিলন যে, জঙ্গী হিন্দুরা মসজিদ ভাঙ্গায় বদ্ধপরিকর।

মসজিদ ভাঙ্গার পূর্বে ভারতের দুটি পত্রিকা 'পাইওনিয়ার' ও 'ইনডিপেন্ডেন্ট' জানায় য, "মধ্যপ্রদেশের চম্বল নামক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ৫০০ শীব সেনা ১৫ দিন ধরে মসজিদ ভাঙ্গার প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে অযোধ্যায় অবস্থান নিয়েছে।"

মসজিদ ভাঙ্গার পূর্বে রাজ্যের মূখ্য মন্ত্রীর মসজিদ ভাঙ্গার দৃঢ় সংকল্প, গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের পরও তিনি মসজিদটি রক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ নেননি। ভিপি সিং এর সময়কার হাজার হাজার পুলিশের কঠোর বেষ্টনি ভেদ করেও জঙ্গী হিন্দুরা মসজিদে হামলা চালিয়েছিল। সে ঘটনা তার জানা থাকার পরও জঙ্গী হিন্দুদের মসজিদে হামলা না চালানোর মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট হয়ে এবং লক্ষ লক্ষ জঙ্গীকে ঠেকানোর জন্য রাজ্য সরকারের মাত্র ৫০০ পুলিশ মোতায়েন করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ৩০শে নভেম্বর পিটিআই পরিবেশিত এক খবরে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার মসজিদ রক্ষায় ১৫ হাজার সৈন্য অযোধ্যায় মোতায়েন করেছে। তারা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য গঠিত বিশেষ কমান্ডো বাহিনীও টহল দিচ্ছে। মসজিদের ভিতরে ৪০০ ক্ষিপ্তগতি সম্পন্ন সৈন্য অবস্থান নিয়েছে। মসজিদের বাইরে দেড় হাজার সৈন্য দাঙ্গাবিরোধী সরঞ্জাম, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট, পানি কামান নিয়ে অবস্থান নিয়েছে।

এ মসজিদ ভাঙ্গার এক সপ্তাহ পূর্বের ঘটনা। কিন্তু মসজিদ ভাঙ্গার সময় কমান্ডো, ক্ষিপ্ত সৈন্যরা কোথায় ছিল? মসজিদ ভাঙ্গার সময় তো কোন সৈন্য বা পুলিশের নাম গন্ধও ছিল না? বরং ঘটনার ১০ মিনিট পূর্বে ক্ষুদ্র পুলিশ বাহিনীকেও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। মসজিদ ভাঙ্গার পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলেন যে কুয়াশার কারণে সৈন্যদের ঘটনাস্থলে পৌছতে দেরী হয়েছিল। প্রবল তুষার ঝড় উপেক্ষা করে যে সৈন্যদের কাশ্মীরী মুজাহিদদের ধরার নামে নিরিহ গ্রামবাসীদের ধরে আনতে কষ্ট হয় না তাদের কিনা কুয়াশার জন্য অযোধ্যায় পৌছতে এক সপ্তাহ দেরী হল! যে ঐতিহাসিক মসজিদটির বিতর্ক নিয়ে সারা দেশে তোলপাড়, সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা যার সাথে জড়িত, যার সাথে ২০ কোটি মানুষের নিরাপত্তা ও চেতনার প্রশ্নটি জড়িত সেই দুর্ঘটনাটির দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে কিভাবে নির্দোষ দাবী করবে কংগ্রেস বা নরসিমা রাও?

বাবরী মসজিদ নিয়ে এদেশের কতক লোকের অসাম্প্রদায়িকতা চর্চা ও কদর্য বাতচিৎঃ

বাবরী মসজিদ পরিস্থিতি নিয়ে এদেশের একশ্রেণীর ভারতীয় স্বার্থের তকমা আটা রাজনীতিক আরও একটা কর্দয খেল খেললেন। এইসব জননেতা (?), নেত্রীরা ভারতের মসজিদ ভাঙ্গা ঘটনাকে নিন্দা জানাতে পারেনি, পারেনি পুণরায় বাবরী মসজিদ যথাস্থানে নির্মাণ করার দাবী জানাতে। এরা রাজপথে নেমে আসা প্রতিবাদী জনগণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্য প্রধান সহ কয়েকজন নেতার সাথে আদভানীর আতাতের পর মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে বলে প্রচার করেন এবং এলাকায় এলাকায় শান্তি বাহিনী গঠন করার আহবান জানান। রাজপথে নেমে আসে তাদের বাহারী শান্তি মিছিল। অর্থাৎ মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী জনগণকে তারা শান্ত থকার সবক দেন এবং বুঝাতে

চান, মসজিদ ভাঙ্গা কোন ঘটনা নয়, ওটা পুনঃ নির্মান বা অপরাধীদের শাস্তি দাবী করারই প্রয়োজন কি?

কোন কোন নেত্রী আবার বলে ফেললেন যে, "ভারত সরকার যেমনি মসজিদ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে তেমনি এদেশের সরকারও এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে ব্যর্থ তার পরিচয় দিয়েছি।" অর্থাৎ সরকার এদেশের জনগণকে মসজিদ ভাংগার পক্ষে প্রতিবাদ জানাতে সুযোগ দিয়েছেন, তাদের কঠোর হস্তে শান্ত রাখেননি বলে এই মানুষটির বড় আক্ষেপ! তাছাড়া ভারতের জঙ্গী হিন্দুদের কর্মকাণ্ড ছিল বর্বরতম এবং সাম্প্রদায়িক আর এদেশের জনগণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র এ পাথক্যটুকু উপলব্ধি করার মত সেন্স উক্ত মানুষটির আছে কি? এদেশের সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির ওপর ভারত একের পর এক আগ্রাসন চাপিয়ে দিলেও, সেদেশের কোটি কোটি মুসলমানের ওপর নির্যাতন হলেও এদের নিন্দা জানাবার সাহস নেই, বুকের ওপর এল, এম, জি ঠেকিয়ে হাজার রাউন্ড গুলি খরচ করলেও যারা ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি কথা খরচ করতে পারে না তাদের রজানীতি যে এদেশের সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজার মধ্যে সীমিত থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

বাবরী মসজিদের ভবিষ্যৎঃ

সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন ভারতের মুসলমানরা সেদেশে হিন্দু কাপালিকদের কর্তৃক দখল করে নেয়া ও তালাবদ্ধ সাড়ে চার হজার মসজিদসহ পূণনির্মিতব্য বাবরী মসজিদে একযোগে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া নামাজ আদায় করবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নরসিমা রাও এক বছরের মধ্যে মসজিদ তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দিযে জনরোষ হ্রাস পাওয়ার মওকায় আছেন। মসজিদের স্থানে তা ৎক্ষণিক ভাবে যে কায়দায় মন্দির গড়ে উঠে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে সে মন্দির অপসারণ করতে পারেননি। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও যেভাবে উগ্র হিন্দুদের তাড়িয়ে নিজেরাই নবনির্মিত মন্দিরের রামমূর্তিকে পূঁজা করেছে তাতে তিনি মন্দির ভেঙ্গে পুরো ভারতে দ্বিতীয়বার সাম্প্রদায়িকতার আগুন জালানোর ঝুকি নেবেন কি? সে যাই হোক ইতিহাস বলে অন্য কথা। ন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের মত মসজিদ দীর্ঘদিন বিরান হয়ে। কমুনিজমের কঠোর নিষ্পেষণে মধ্য এশিয়ার হাজার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, মসজিদ হয়েছিল নাট্যশালা, বার, পাঠাগার, নৃত্যমঞ্চ। কিন্তু মাত্র ৭০ বছরের ব্যাবধানে তারাই আবার সেই বন্ধ মসজিদ গুলোকে নিজ হাতে খুলে দিয়েছে। নূহ (আঃ)-এর নৌকা একবার কাফেররা অপবিত্র করে দিয়েছিল, কিন্তু সেই কাফেররাই আবার তার নৌকাকে পবিত্র করে দেয়। এমনিভাবে আলবেনিয়া, ইরিত্রিয়া, চীন, বুলগেরিয়া আফগানিস্তানের বন্ধ মসজিদগুলোতে আজ রীতিমত মুসলমানদের ভীড় জমছে। সুতরাং এই জঙ্গী হিন্দুরাই যে পুনঃরায় বাবরী মসজিদ নির্মাণ করে দেবে এবং মুসলমানরা শুকরিয়া নামাজ আদায় করবে ইতিহাস তাই বলে।

ইতিহাসের শিক্ষাই হলো, যারা সত্যকে হত্যা করতে চায়, তারা লক্ষগুণ শক্তিশালী হলেও একদিন তাদেরকে ইতিহাসের আদালতে দাড়াতে হয়, ইতিহাসের বিচারে তাদের স্থান হয় আবর্জনার স্তুপে।

আমার দেশের চালচিত্র

(১৬ পৃঃ পর)

রাশিয়ার নাস্তিকগোষ্ঠির শোচনীয় পরাজয় ঘটে পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নত এবং সরল-সোজা একদল আফগানীর কাছে। ফেরাউন, নমরুদের পরিণতির কথা বিশ্বের সকলেরই জানা আছে। সুতরাং নাস্তিক দাবীদার এই মুরতাদ মৃত্যুর পর যে ডাষ্টবিনে পচবেন না বা নদীতে ভেসে কুকুর-শকুনীদের আহার্য হবেন না তার গ্যারান্টি কে দেবে। কেননা, নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দিয়ে তিনি ইতিমধ্যে জানাজা বা মুসলমানদের করবস্তানে সমাহিত হওয়ার অধিকার হারিয়েছেন।

একই সময়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জে পীর নামধারী আর এক ভণ্ড ও মুরতাদ গজিয়েছে। সদরুদ্দিন চিশতি নামের ঐ মুরতাদ মনে করে, "রাসূল (সাঃ) বিশ্বের সমগ্র জাতির জন্য নিজেই আল্লাহ এবং আল্লাহর পুত্র। আপন মন ও দেহে যা' উদয় হয় তাই সালাত।" এছাড়া সে ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে নাকি কুসংস্কারের গন্ধ পায়, তার কাছে কুরআন ও হাদীস অলিক বলে মনে হয়।

অতএব, দেশে মুরতাদদের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে। ধর্মের ওপর ওরা একের পরএক আঘাত হানছে। সুতরাং এখুনি এদের প্রতিরোধ করতে হবে। কুরআনের বিধান অনুযায়ী নির্ভিক চিত্তে ওদের যোগ্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। কে আছেন সব কিছুর বিনিময়ে কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করার নির্ভিক সৈনিক?

কৈফিয়ত

বিশেষ কারণে গতসংখ্যার প্রতিশ্রুত মল্লিক আহমাদ সরওয়ারের দ্বিতীয় ধারাবাহিক উপন্যাস এ সংখ্যা থেকে প্রকাশে অপারগতায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

—নির্বাহী সম্পাদক।

বসনিয়ায় জাতিসংঘের সামরিক হস্তক্ষেপ আর কত রক্ত চাই!

আব্দুল্লাহ আল নাসের

আবারও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিল বিশ্ব মুসলিম স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান ও,আই,সি নামক সংস্থাটি। চিরাচরিত কায়দায় চলতি মাসের ১ ও ২ তারিখে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন শেষে এক খসড়া প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘ প্রস্তাব লঙ্গনকারী সার্বীয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ ও বসনিয়ার ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার আহবান জানানো হয়। অর্থাৎ পুরানো রেকর্ডগুলিই আবার বাজানো হয়েছে। ওআইসির ৬ সাস পূর্বেকার ইস্তাম্বুলের সভা এবং বিভিন্ন সময়কার আহবানেও বারংবার এই রেকর্ডগুলি বাজানো হয়েছিল। বসনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকারের পর সম্মেলন আহবানের সময় ওআইসি-র মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ বলেছিলেন, "পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে বসনিয়ার সার্বদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।" স্বভাবতই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, এবার বুঝি মুসলিম বিশ্বের ঘুম ভাঙ্গবে। জাতিসংঘ ও পশ্চিমা জগতের বসনিয়া নিয়ে নাটক করার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। মুসলিম মুজাহিদরা একজন তারিক বা কাসিমের নেতৃত্বে তাদের বসনিয় ভাইদের রক্ষা করতে ছুটে যাবে আবার সেই ঐতিহাসিক বসনিয়ার বুকে। মর্দ্দে মুজাহিদ তুর্কী সুলতান মুরাদ অথবা সুলতান মুহাম্মদের ন্যায় সার্বদের মাটিতেই মসুলিম রক্ত পিপাসু সার্বীয় পিশাচদের মিটিয়ে দেবে যুদ্ধের সাধ। কিন্তু না, সম্মেলন শেষে দেখা গেল মহা-সচিবের কথা নিছক বাগারম্বরই। অর্থাৎ যত গর্জে তত বর্ষে না। অবশ্য দু' একটি দেশ ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে জাতিসংঘ যদি কোন বাস্তব পদক্ষেপ না নেয় তবে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসনিয়ায় অস্ত্র প্রেরণের কথা বলেছে। ভাল উদ্যোগ এবং নিঃসন্দেহে এটা একটা ঈমানী কাজ হবে। কিন্তু তা এত বিলম্বে কেন? বসনিয়দের এই মুহূর্তে অস্তিত্ব রক্ষায় অস্ত্রের খুবই প্রয়োজন। গত আট মাস যাবত ওআইসি সহ সমগ্র বিশ্ব জাতিসংঘকে বসনিয়ার আত্মরক্ষার জন্য সেদেশের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলেছে, কিন্তু জাতিসংঘ তাতে কর্ণপাত করেনি, বরং সার্বদের হাতে একের পর এক বসনিয় নগরীর পতন ঘটতে দেখেছে, অধিকৃত এলাকার মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে এলাকা শুদ্ধি করণ দেখেছে। মুসলিম তরুণী ও কিশোরীদের ধর্ষণ শেষে হত্যা করার জন্য সার্বদের ধর্ষণ শিবির স্থাপন করাও প্রত্যক্ষ করেছে এই জাতিসংঘ এবং সভ্যতা ও মানবাধিকারের আলখেল্লা পরা পাশ্চাত্য দেশগুলি। সার্ব বাহিনী সারাজোভো নগরীর সাথে বহিঃবিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা বন্ধ করে সেখানে ট্যাঙ্ক মোতায়েন করে, নগরীর অবরুদ্ধ অধিবাসীদের নগর ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছে। বিমান বন্দর পূর্বাহ্নেই বন্ধ হয়ে গেছে সার্বীয়দের চোরাগুপ্তা হামলার জন্য। সুতরাং তীব্র শীতে খাদ্য বস্ত্র পানীয় ও অস্ত্রের অভাবে এমনকি বহিঃবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে নগরীর মানুষগুলো কবরের পরিবেশে বাস করছে। এরকম আর কয়েকদিন চললেই সারাজোভোর পতন অনিবার্য। এ পরিস্থিতি উন্নতির জন্য বসনিয়াদের এখন গোলা বারুদের দরকার। অথচ জাতিসংঘ বা পশ্চিমা বিশ্বের নেই কোন উদ্যোগ। যেন সারাজোভোর পতনই তাদের একান্ত কাম্য। এই নগনীর পতন ঘটলেই তারা বেশী বেশী ত্রাণ সামগ্রী বিতারণ করতে পারবে, মানব সেবার বহরও তাদের বৃদ্ধি পাবে। কি বিচিত্র মানব সেবা!

মুসলিম দেশগুলিও যদি সারাজোভোর পতন দেখতে না চায় আর যদি জাতিসংঘ প্রস্তাব উপেক্ষা করার কোন ইচ্ছে থাকে তাহলে বসনিয়দের এই মুহূর্তে অস্ত্র সরবরাহ করছে না কেন? সুদূর ১৫ই জানুয়ারীর পর সারাজোভোর যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে তারা কোথায় বা কাদের উপকারের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করবে? ১৫ই জানুয়ারী কেন খুব শীঘ্র যে জাতিসংঘ বা ইউরোপীয় সম্রাজ্য বসনিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্যোগ নেবে না সে কথাতো ওআইসি সম্মেলনে আগত সাবেক যুগোশ্লাভিয়া সংক্রান্ত জেনেভা ভিত্তিক সম্মেলনের সহ চেয়ারম্যান মিঃ সাইরাস্লভান্স এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের দূত মিঃ ওয়েন সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট বলে গেলেন। তারপরও কেন এত বিলম্ব?

বসনিয়ায় গত এক বছর যাবৎ যা কিছু ঘটছে তার জন্য পুরোপুরি দায়ী জাতিসংঘ নামক সংস্থাটি। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় এ সংস্থাটি সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিস্ফোরক জাতীয় কথা বলায় ভারী ওস্তাদ। বিশ্ব বিবেককে বোকা মনে করে মানবা-ধিকার রক্ষার মোড়কে এ যাবৎ বসনিয়ার বেলায় যতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সবই ছিল বসনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী। জাতিসংঘ প্রথমে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিন্তু তা তদারক করার মত কাউকে নিয়োগ করেনি। ঐ নিষেধাজ্ঞার আওতায় বসনিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এই সদ্য স্বাধীন দেশটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তখন প্রধান জরুরী কাজ ছিল অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা।

অথচ চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মোকাবিলা করে তারা যাতে টিকে থাকতে না পারে সেজন্য অত্যন্ত সুকৌশলে মানবাধিকার রক্ষার বাহানায় তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ ৮ মাস পরে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাচ্ছে, বসনিয়রা চোরাচালানের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ অস্ত্র পেয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছে, ঠিক তখন তাদের সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করার জন্য আড্রিয়াটিক সাগরে নৌ অবরোধ জোরদার করার জন্য পশ্চিমা যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর কানাডা ও ফ্রান্সের সৈন্যদের সার্বদের সাহায্য করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অন্য দিকে আড্রিয়াটিকসাগরে মোতায়েন পশ্চিমা যুদ্ধ জাহাজগুলোকেও অবরোধ জোরদার করার নামে নিজেরাই সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে বিভিন্ন পণ্য ও অস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। দু'মাস পূর্বে বসনিয়ার আকাশকে বিমান উড্ডয়ন মুক্ত ঘোষণা করেছিল এই জাতিসংঘ। কিন্তু তাও তদারক করার কেউ ছিল না। সার্বিয় জঙ্গী বিমান এ পর্যন্ত ১৪২ বার সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন নগরী ও স্থাপনায় বোমা বর্ষণ করেছে। দীর্ঘ সময় শেষে নো-ফ্লাইজোন তদারক করার জন্য জাতিসংঘ ভাবছে! বসনিয়ার ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার প্রশ্নে কোন কোন কর্মকর্তা দাঁত বের করে জবাব দিচ্ছে, "বসনিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে বলকান এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পরবে।" অর্থাৎ বসনিয়রা অস্ত্র পেলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হবে তার চেয়ে ওরা বিনা অস্ত্রে একতরফা মার খেয়ে সমূলে মারা যাক সেটাই ভাল। তাহলে বলকান এলাকায় আর যুদ্ধ ছড়াবে না। একেই বলে শান্তির পৃথিবী গড়ার নিউ ওয়ান্ড অর্ডার!

বসনিয়ার পরিস্থিতি মার্কিন নীতির খোলস খুলে ফেলেছে। সার্বীয় বাহিনী গেলো সপ্তাহে একটি মার্কিন পরিবহন বিমানকে গুলি করে ক্ষতিগ্রস্থ করার পর বিমান বন্দরে ত্রাণ পরিবহণ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর পূর্বে একটি ইতালীয় পরিবহন বিমানও অনুরূপভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু এ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য কে দায়ী তা' তদন্ত করার জন্য ফ্রান্স, আমেরিকার কোন উদ্যোগ নেই। অথচ লকারবির বিমান দুর্ঘটনার জন্য নিছক সন্দেহ করে লিবিয়ার ওপর কত অন্যায় ও জঘন্য প্রতিশোধ নিল! একই সময়ে ফ্রান্স ও বৃটেনের ধারণা যে, বসনিয়ায় নো-ফ্লাই জোন কড়াকড়ি করলে বা বসনিয়ার ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে সার্বীয়রা তাদের বাহিনী যা' ঐ এলাকায় মোতায়েন আছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার আমেরিকার যুদ্ধ মন্ত্রীর ভাবনা আরও এক কাঠি সরেস। বসনিয়ায় মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে তা' তার বোধগম্য হচ্ছে কিন্তু মানবাধিকার রক্ষা করায় আমেরিকার সৈন্যদের হস্তক্ষেপ করতে দিতে রাজী নন। কেননা বসনিয়া পার্বত্যময় এলাকা, ইরাকের মত সমতল নয় যে কার্পেটিং বোম্বিং করে মানবাধিকার রক্ষা করা যাবে। মার্কিনী সৈন্যদের হয়ত পার্বত্য যুদ্ধের কোন ট্রেনিং নেই তাই এই মহাপণ্ডিত মার্কিনী সৈন্যদের জীবনের ঝুকি নেয়ার ঘোর বিরোধী। সর্ব প্রধান কথা, বসনিয়ায় কোন মার্কিন স্বার্থ নেই যা' আছে সোমালিয়ায়। সোমালিয়ায় অল্প ব্যায়ে এবং কম ঝুকি নিয়ে সহজেই মানবাধিকারের ত্রাণ কর্তা সেজে বিশ্বের বাহবা কুড়ানো সম্ভব। সোমালিয়ার খোলা মাঠে গোল দিতে মার্কিনীদের যত সহজে সম্ভব বসনিয়ায় তত সহজ নয়। এছাড়া বসনিয়ায় হস্তক্ষেপ করার জন্য যে পরিমাণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা খারাপ পরিস্থিতির প্রয়োজন তা' নাকি এখনো ঘটেনি। সবেমাত্র না টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাবের খবর শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় লোকজন কেবল না দূষিত পানি পানকরে টাইফয়েডে আক্রান্ত হচ্ছে। মরুক না সোমালিয়ার মত প্রতিদিন হাজার হাজার বসনীয়। তারপর না হয় মানবাধিকার উদ্ধারে মহামানবদের পাঠানো হবে। আপাততঃ সোমালিয়ার যাত্রাই শুভ।

পশ্চিমা কুটনীতিবাজদের তৎপরতায় বসনিয়ার ওপর আরো একটি আঘাত হানা হয়েছে। ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষে বসনিয় প্রেসিডেন্ট আলীজা ইজ্জত বেগ যখন দেশের বাইরে ঠিক তখনি তাঁর অজ্ঞাতে সারাজোভো বিমান বন্দরে ক্রোট ও সার্ব যুদ্ধ কমাণ্ডারদের এক গোপন বৈঠক বসে এবং সে বৈঠকে দু'পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ইতিপূর্বে বসনিয় ও ক্রোটরা মিলিতভাবে সারাজোভো নগর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ক্রোটদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে, সার্বরা সারাজোভোসহ বিভিন্ন নগরীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, দখল করে নেয় সারাজোবোর সাথে বাইরের সংযোগ সড়কটি।

সুতরাং বসনিয় মুসলমানরা আজ এক বিরাট ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এক প্রকার বিনা অস্ত্রে আল্লাহ্‌র ওপর অটল বিশ্বাস, ধৈর্য আর অপরিসীম সাহসকে পুঁজি করে তারা টিকে আছে। কিন্তু পরিস্থিতি, বৈরি পরিবেশ, কুচক্রীদের অব্যাহত চক্রান্তের ফলে তাদের ধৈর্য, সাহসের বাঁধ ভেঙ্গে পরার উপক্রম। ইতিহাসের অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার হুমকীর সম্মুখিন ইউরোপের বুকের একটি সভ্য মুসলিম জাতি। আজ আমরা মুসলিম জাতি যদি তাদের এই দুর্দিনে সকল অপশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তাদের সাহায্যে ছুটে না যাই আর আমাদের অবহেলায়, কর্তব্যহীনতায় তাদের ওপর নেমে আসে কোন দুঃসহ কালো অধ্যায় তবে তার জন্য আমাদেরই দায়ী হতে হবে, একদিন কৈফিয়ত দিতেই হবে।

আমার দেশের চালচিত্র

ফারুক হোসাইন খান

আবার সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এবার আর কোন ছাত্র বা মিছিলের ওপর হামলা নয়। এবার দেশের শ্রেষ্ঠ আলিম শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের ওপর হামলা করেছে অতি পরিচিত দেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানীদাতা হিন্দু–বৌদ্ধ–খৃষ্টান পরিষদের অঙ্গ সংগঠন যুব ঐক্য পরিষদের কিছু কুলাংগার যুবক। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় দায়ীদেরকে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যখন প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছিল ঠিক তখনই মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার মতলবে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের মদদে ঐ সংগঠনের কিছু ছাত্র নামধারী গুণ্ডা দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ব্যক্তির ওপর হামলা করে বসল। এ হামলা শুধু একজন ব্যক্তির ওপর হামলা নয়। যেহেতু এ হামলা মুসলমান ও ইসলামের পক্ষে সংগ্রামরত থাকার কারণেই হয়েছে, দাড়ি টুপি থাকার কারণেই হয়েছে সেহেতু এ হামলা ইসলামের ওপর হামলা বই কি? দেশের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সামনেই সংগঠিত হয়েছে এ দুঃসাহসিক ও লজ্জাস্কর ঘটনা। অন্যায়ের প্রতিবাদে সর্ব প্রথম সোচ্চার হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদে সর্বপ্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই রক্ত দিয়েছিল। এছাড়া ১৯৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৯০ এর আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই সর্বপ্রথম রক্ত দিয়েছে, রাজপথে নেমে এসেছে। কিন্তু আজ সে ঐতিহ্য নেই। হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে গুটি কতেক বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্ট অবস্থান নিয়ে এদেশের আপামর জনগণের স্বার্থ ও ধর্মীয় অধিকারের ওপর একের পর এক ছোবল হানছে, কিন্তু তারা নির্বিকার। সন্ত্রাসীরা তাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আমাদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যে কুঠারাঘাত হানছে কিন্তু তাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ধর্মীয় অধিকার ও দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের এই ব্যর্থতা সত্যিই লজ্জাস্কর।

এ ব্যাপারে দেশের প্রশাসনের আশ্চর্য নিরবতা আরও পীড়াদায়ক। এই পরিচিত এলাকায় এর পূর্বেও বেশ কয়েকবার দাড়ি টুপিওয়ালা মুসলমান নিগৃহিত হয়েছে। মিছিলের ওপর হামলার কারণে মাদ্রসার ছাত্রদের রক্ত ঝরেছে। কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত সেই দুষ্কৃতিকারীদের কাউকে গ্রেফতার করার পদক্ষেপ নেয়নি। জনগণের জান মালের নিরাপত্তার সাথে ধর্মকেও নিরাপদ রাখার দায়িত্ব সরকারের। ধর্ম পালনের জন্য তাদের ওপর হামলা হচ্ছে অথচ সরকার তার প্রতিবিধানে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি, পারেনি পার্লামেন্টে ধর্মের সুরক্ষায় কোন আইন পাশ করতে। প্রতিবেশী দেশে ১৯৯০ সালে বাবরী মসজিদ নিয়ে উত্তেজনার সময় এই দেশের একটি হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে সেদেশে মন্দিরের শিলা বিন্যাসের জন্য স্বর্ণের ইট পাঠানো হলো অথচ তখনকার স্বৈরাচারী সরকার নিশ্চুপ ছিলো। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে ঐ মহলটি সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছে, মসজিদ ধ্বংসের পর আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করছে অথচ সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি মিছিল করে রাজপথ গরম করতে পারলেও তাদের অপকর্ম বন্ধ করতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

অতএব বলতে হচ্ছে, সরকার যদি জনগণের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ওপর অব্যাহত ছোবল মারার কেউটেদের দমন করতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণকে তাদের অধিকার রক্ষা এবং কেউটেদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়ার দায়িত্ব সেই তৌহিদী জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। সরকার যদি তাতে অনীহা প্রকাশ করে তবে তৌহিদী জনগণকেই তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করে এগিয়ে আসতে হবে গঠন করতে হবে। বাতিলের প্রতিরোধে কে আছেন এই সাহসী যোদ্ধাদের একত্রিত করণ গঠন ও পরিচালনা করার মত সাহসী মুজাহিদ?

তথাকথিত সভ্যতার সর্বশেষ উপহার বিউটি পারলার। আমাদের দেশেও এই প্রতিষ্ঠানটির ডাল–পালা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বদৌলতে রাস্তায়, ফুটপাতে, মার্কেটে, অফিসে সর্বত্রই বব কাটা চুল, স্কার্ট, জিনসের প্যান্ট শার্ট পরা ও বিদেশী উগ্র মেকাপ চর্চিত ললনাদের ভীড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেন এরাই নগরীর শোভা বর্ধন করছে। সমাজের উঁচু তলার ললনাদের (সবাই নয়) রুটিন মাফিক প্রতিদিন নাট্যমঞ্চ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাইট ক্লাব, পার্ক প্রভৃতি স্থানে হাজিরা দিতে হয়। সুতরাং অনাগত অথিতিদের মধ্যে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দরী প্রতিপন্নকরার জন্য তাদের মধ্যে বাহারী প্রসাধন চর্চার একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় বিউটি পারলারের। এই বিউটি পারলারের "বিউটিশিয়ানদের" অমূল্য পরামর্শে (?) ললনাদের লম্বা চুল বব কাট হয়, ব্লাউজের গলা লো কাট হতে হতে বোগল পর্যন্ত এসে দাড়ায়। পোষাকের ফিটনেস, ফিটনেস ক্রমশ বাড়তে থাকে।

লেটেস্ট মডেলের গাড়ীর পেছনে যখন এসব ম্যাডামেরা বসে থাকেন তখন মনে হয় কাচের পুতুল বসে রয়েছে। গাড়ি থেকে নামার সময় মাটিতে পা পড়তেই চায় না। এসব কিছুই বিউটি পারলারের অবদান। কোন বিউটিশিয়ানই বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন না যে, তারা দেশ–সমাজ বা নারী জাতির ভালোর জন্য কিছু করছেন। ইদানিং বিউটি পারলারের মধ্যে রূপচর্চার নামে অসমাজিক কাজেরও হিরিক পরে গেছে। সে যাই হোক, এই স্থান থেকে ললনাদের চেহারায় কৃত্রিম প্লাষ্টার লাগানোর মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নিজেকে সুন্দরী প্রতিপন্ন করে লোভাতুর পুরুষের নিকট থেকে বাহবা কুড়ানো অর্থাৎ ভোগ্য পণ্যের মত তাদের মনোরঞ্জন করা। এতে তাদের নিজেদের কোন আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক বা চারিত্রিক কোন উন্নতিই ঘটে কিনা জানিনা তবে অহেতুক যে নিজের পয়সা খরচ হয়, সমাজে নগ্নতার প্রসার ঘটে, নিজের মনটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে তা অস্বীকার করতে পারবেন না। বিউটি পারলারের মোহে পড়ে এই খাতে কোন কোন চাকুরীজীবী মহিলা নিজের অথবা পরিবারের আর্থিক উপার্জনের ৩৫ থেকে ৪০% ব্যয় করে ফেলেন। এতো গেলো লাভ–ক্ষতির কথা ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের অপরাধ কতখানি এবার তাই দেখা যাক। ঐসব উচ্ছৃঙ্খল মহিলারা ফরজ পর্দা পালন করতে আগ্রহী হলে তারা নিজের পয়সা খরচ করে পরের চোখের মনোরঞ্জনের খোড়াক হতো না। আল্লাহ্ মানুষকে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য দিয়েছেন তাতে তুষ্ট না হয়ে কৃত্রিম প্রলেপ লাগাতে ব্যস্ত হত না। সুতরাং এই মহিলারা প্রথমত একটা ফরজ দায়িত্ব উপেক্ষা করে নগ্নতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়াচ্ছে যা' দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত তারা ব্যক্তিগত অর্থের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় অর্থেরও অপচয় করছে। অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে দেশের সীমীত অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে দামী প্রসাধনী আমদানীতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। আর এর সবকিছুর মূলে রয়েছে এই বিউটি পারলার। সুতরাং দেশেকে উচ্ছৃঙ্খলতা, নগ্নতা ও আর্থিক অপচয় থেকে রক্ষা করতে হলে শয়তানের আড্ডাখানা ঐ সব পার্লার গুড়িয়ে দিতে হবে। কে হবেন সেই সাইমুম বাহিনীর দোর্দন্ড কমাণ্ডার?

আবার ডঃ আহম্মদ শরীফের শিং গজিয়েছে। তৌহিদী জনগণের ধর্মের স্বাধীনতায় সে আবার খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিছুদিন পূর্বে তারই গর্ভে জন্ম নেয়া "স্বদেশ চিন্তা সংঘ" নামক সংগঠনটির আয়োজনে এক বক্তৃতায় তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মারাত্মক কটুক্তি করে সারা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রচণ্ড ধিক্কার কুড়িয়ে কিছুক্ষণ শেয়াল পণ্ডিতের ন্যায় গর্তে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দেশের জনগণের দৃষ্টি যখন ভারতের বাবরী মসজিদের পানে, তার জ্ঞাতী ভাইরা হিংস্র আক্রোশে ফুসছে মসজিদ ভাঙ্গার জন্য ঠিক তখনই সুযোগ বুঝে এই শিং ওয়ালা পণ্ডিত গর্ত ছেড়ে লোকালয়ে এসেছে। সাথে সাথে এসেছে তার এক ঝাঁক আনকোড়া শিষ্য। ৫ই ডিসেম্বর টিএসসির সেমিনার কক্ষে সেই স্বদেশ চিন্তা সংঘের আয়োজিত এক সভায় এই গুরু–শিষ্যের মিলন ঘটে। শুধু কি মিলন বক্তৃতারও সেকি তুফান! বলতে গেলে সেদিন শ্রোতার চেয়ে বক্তার সংখ্যাই বেশী ছিল। তবে সবারই বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল ইসলাম, নামায, আজান ও কুরআন। এদের একজন আব্দার জানিয়েছেন রেডিও, টিভিতে আজান প্রচারিত হয় কেন। আজানের শব্দ শুনলে শয়তানের চেলাদের মত তিনিও হয়ত অস্বস্তিবোধ করেন, তাই তার এই আব্দার। আর একজনের কথা হল, ওনারা খুবই উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত মহামানব, আর মানুষকে পশ্চাতপদতার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য মাদ্রাসাগুলো যথেষ্ট। আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ নামে এক পণ্ডিত সিনেমার কাহিনীর সাথে মিল রেখে যৌন আপত্তিকর দৃশ্যও চিত্রায়নে আহবান জানিয়েছেন। এদেশের কোন নায়ক–নায়িকাতো এই দৃশে অভিনয় করবেন না, কাদেরকে দিয়ে তিনি এই দৃশ্য চিত্রায়িত করাতে চান তা কিন্তু তিনি বলেন নি। ফয়েজ আহমেদ মার্ক্স–লেলিনের মত মহামানব আর খুঁজে পাচ্ছেন না বলে মত প্রকাশ করেন। যে মার্ক্স–লেলিনরা এখন গোরস্তান থেকে নদীর বক্ষে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে। রতনে রতনই চেনে! আর এক স্বঘোষিত পণ্ডিত ইতিহাস সম্পর্কে নির্বোধ বালকের ন্যায় অবলিলায় বলে গেলেন যে, কাজী নজরুর ইসলাম ও ইবনে সীনা নাস্তিক ছিলেন এবং বিশ বছর পর মুসলমানরা তাদের মত আহমেদ শরীফকে নিয়েও নাচানাচি করবে। তার এই বক্তব্য রাবনের মৃত্যুর সময়কার উক্তির সাথে মিলে। রাবন নাকি রামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'ইতিহাসে যদি তোমার নাম বীর হিসেবে লেখা হয় তবে আমার নাম ঘৃণার সাথে হলেও তোমার পাশে লেখা থাকবে।' ঠিক তদ্রুপ মুসলমানরা বিশ বছর পর নজরুল বা ইবন সীনাকে স্মরণ করার সময় যদি আহমদ শরীফকেও স্মরণ করে ফেলে তবে নজরুল ও ইবনে সীনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিলে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু' এক পাটি জুতো জুটেও যেতে পারে।

ডঃ আহমেদ শরীফ যেহেতু এক বিশাল পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যক্তি এজন্য ইসলামের বিরুদ্ধে সেদিনও তার বক্তৃতা ছিল বেশ বড়াবড়া। নিজেকে একজন যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনে করেন কিনা! এই ব্যক্তি আবার মৃত্যুকেও কিনা ভয় করেন না। কিন্তু তিনি হয়ত জানেন যে, পৃথিবীর ইতিহাস বলে, যে যত বেশী সীমা লংঘন করে তার পরিণতিও তত নিকৃষ্ট হয়, তার মৃত্যুটা সুখপ্রদ হয় না। মিথ্যা নবীর দাবিদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মরেছিল পায়খানায় ডুবে, আরবের বিখ্যাত বীর আবু জাহেল মরেছিল একজন ক্ষুদে কিশোরের হাতে, আবু লাহাব মরে ছিল নাকি কুষ্ঠরোগে, পরাশক্তি

(১২ পৃঃ দেখুন)

ভারত ভাঙতে আর কত দেরী?

ফারুক আবদুল্লাহ

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে খলদুনের মতে, প্রতি ৫০ বছর পর যে কোন রাষ্ট্রের কাঠামো ও চরিত্র পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক রাষ্ট্র সাধারণত তিন পুরুষ বা ১২০ বছরের অধিকস্থায়ী হয় না। সমাজ সংহতি বা মানবের ঐক্যবোধই রাষ্ট্র শক্তির মূল ভিত্তি। এই ঐক্য বোধ যত শিথিল হয় রাষ্ট্রের ভিত্তিও তত দুর্বল হবে।

বিশ্ব অঙ্গণে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক ভাঙ্গা-গড়ার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার এই মতের যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭০ বছরের মাথায় ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়েছে, মর্শাল টিটোর সুযোশ্লাভিয়া আজ খণ্ড বিখণ্ড, চেকোশ্লাভিয়া দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে, দুই জার্মানও দুই ইয়ামেন এক হয়েছে, দুই কোরিয়া এক হওয়ার পথে। ইরান, আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, রুমানিয়ার পুরানো শাসন কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটেছে। বলতেগেঁলে চলতি দশকের শুরুতেই বিশ্বব্যাপী ভাঙন ও পরিবর্তনের হাওয়া এত জোরালো ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে, মান-চিত্রকাররা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। তারা চিন্তায় হিমশিম খাচ্ছে এই ভেবে যে, "আজ তারা যে মানচিত্র আঁকছে আগামী দিন সে মানচিত্র বহাল থাকবে কিনা।"

সোভিয়েট ইউনিয়নের এককালের ঘনিষ্ট সহযোগী ভারতের নেতা ও নীতিনির্ধারক বুদ্ধিজীবী সকল মহল সাম্প্রতিক বিশ্ব ব্যাপী ভাঙ্গনে ও পরিবর্তনের স্রোতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা ও সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ২৫টি রাজ্য, ২০০টির বেশী ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী ও ৪০টি ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে গড়া বিশাল ভারতের অসংখ্য সমস্যা তাদের বুকে বার বার ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার গ্রীন সিগন্যাল বাজাচ্ছে। ভারত মাতার সেবকপূত্রদের এখন 'ত্রাহি মধুসূধন' দশা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতের এককালের বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিংহভাগ যোগানতাদা। কিন্তু সোভিয়েতের অকালে শ্মশান যাত্রায় ভারতের সিথির সিদুঁর মুছে গেছে। সোভিয়েতের অর্থনীতি এখন "দূর্ভিক্ষ ও দেহ ব্যবসায় পরিণত হওয়ায়" ভারতকে তড়িঘড়ি করে তার পণ্যের নতুন বাজার খুঁজতে হচ্ছে। ফলে ভারতের রূপি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের জার্মানীর মার্কের ন্যায় কেবল উর্ধ্বগতিতে পেয়ে বসেছে। দেশের ৯০% মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। বিশ্ব শিশু শ্রমিকদের এক চতুর্থাংশ ভারতে। বিশাল জনসংখ্যার মাত্র ১৯% শিক্ষিত। সর্বোপরি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত নাজুক যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও বলেছেন যে, "কংগ্রেসের সদস্যরা আমার হাত-পা বেধে রেখেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।" পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুও একসময় ভারতের সমস্যার পাহাড় দেখে ভীত হয়ে বলেছিলেন, "এদেশে যতজন মানুষ ততটি সমস্যা রয়েছে।" ভারতের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে সাম্প্রতিক শেয়ার কেলেঙ্কারী। এছাড়া ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হল পর্যটন। অধিকাংশ পর্যটন স্পটগুলো বর্তমানে সংঘাত বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরে অবস্থিত। সংঘাতের কারণে পর্যটকরা সেদিকে ভুলেও পা বাড়ায় না। কাশ্মীর ছাড়াও প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৮০ লক্ষের মত পর্যটকের আগমন ঘটত। কিন্তু জঙ্গী হিন্দুদের কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণে চলতি পর্যটন মৌশুমে বিদেশী পর্যটকরা ভারতকে এড়িয়ে যাচ্ছে। এটা বর্তমান ধ্বসে পড়া ভারতের অর্থনীতির ওপর "মড়ার ওপর খাড়ার ঘা' এর চেয়েও বড় আঘাত।

ভারতের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন অস্তিত্বের ওপর মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। এই মুহূর্তে ভু-স্বর্গ কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভারত এই রাজ্যটি নিজের ভূ-খণ্ডের অংশ বলে দাবী করলেও ছয় লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেও রাজ্যটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল থেকেও রাজ্যটির ভবিষ্যত রাজ্যের জনমতের ওপর ছেড়ে দেওয়ার দাবী উঠেছে। স্বাধীনতাকামীদের দমন করার জন্য সরকার প্রতিদিন কোটি কোটি রূপী ব্যয় করছে। সৈন্যরা সামরিক গাড়িতে করে প্রতিদিন সদম্ভে উপত্যকায় যাচ্ছে আর আসার সময় লাশ বোঝাই করে নিয়ে আসছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিজয় লাভ কাশ্মীরী মুজাহিদদের বাড়তি মনোবল যুগিয়েছে। কেননা কাশ্মীরী মুজাহিদরা আফগানিদের কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করেছে এবং তাদের ঝুলিতে রয়েছে পরাশক্তি রাশিয়ার ফৌজদের পরাজিত করার অভিজ্ঞতা। সুতরাং ভারতের মানচিত্র পুনঃ অংকনের 'সূচনা' এই কাশ্মীর থেকে যে কোন দিন উদ্বোধন করা হতে পারে।

বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য পাঞ্জাবও। এই আন্দোলনের কারণে এ পর্যন্ত যত পরিমাণ রক্ত ঝরেছে তা' দুবার সংঘটিত পাক-ভারত লড়াইয়েও ঝরেনি। একমাত্র ১৯৯১ সালেই এখানে ১৭ হাজার লোক নিহত

হয়েছে। অত্যন্ত তীব্র গতিতে এখানে স্বাধীন খালিস্তান গঠনের আন্দোলন চলছে। এককালের রাজভক্ত নামে খ্যাত শিখরা আজ জীবন বাজী রেখে রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের দেখাদেখি আসামের উলফা ও বোড়ো স্বাধীনতাকামীদের গেরিলা তৎপরতাও ভারতের প্রশাসনের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছে। ভারতের তেলের ষাটভাগ, অকিংশ কয়লা, চা আরও বহু মূল্যবান খনিজ সম্পদ এই রাজ্যটি থেকে আহরিত হয়। কিন্তু আসামে উন্নয়নের কোন ছাপ না থাকায় গেরিলারা আসামের স্বাধীনতা দাবী করেছে। তারা রাজ্যটিতে হাজার হাজার কেন্দ্রীয় পুলিশ ও লক্ষ লক্ষ সেনা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও বন্ধ–ধর্মঘট ডেকে রাজ্যের যাবতীয় উ ৎপাদনের চাকা অচল করে দিচ্ছে। আর এর মারাত্মক প্রভাব পরছে কেন্দ্রীয় অর্থ–ব্যবস্থার ওপর।

ভারতের প্রশাসন গুটিকতেক উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দখলে, তারা রাষ্ট্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা একতরফা নিঁচু জাতের হিন্দুদের বঞ্চিত করে ভোগ করছে, নিচু জাতের হিন্দুরা সে দেশে নির্যাতিত, অবহেলিত। অধিকার হারা আজও একজন ব্রাহ্মণ যে রাস্তায় যাতায়াত করে, যে মন্দিরে পুঁজো দেয়, তার সন্তান যে স্কুলে লেখাপড়া করে সেখানে একজন শূদ্র বা তার ছেলের প্রবেশ অধিকার নেই। সভ্য যুগে সেই আদিম বর্ণবাদী প্রথার জলন্ত প্রমাণ ভারতের বিহার রাজ্য। সর্বত্র এই প্রথা থাকলেও বিহারে হরিজন ও বর্ণ হিন্দু সংঘাত প্রকট। একমাত্র ১৯৯০ সালে এই রাষ্ট্রে বর্ণ–হিন্দুদের কর্তৃক হরিজন হত্যা ও নির্যাতনের ১৭,০০০ ঘটনা ঘটেছে। এখানে সাম্প্রদায়িক অবস্থা এত নাজুক যে হরিজনদের সংগঠন এম, সি, সি ও বর্ণ হিন্দুদের সংগঠন সুরন মুক্তি ফৌজের কর্মীদের মধ্যে প্রতিদিনই দাঙ্গা, খুন, গুমের ঘটনা ঘটছে। ইবনে খলদুনের মতে রাষ্ট্র শক্তিরমূল সমাজ সংহতির ছিটেফোটাও এখানে অবশিষ্ট নেই, যেমনি নেই ভারতের কোথাও।

এসমস্ত আন্দোলনের পাশাপাশি উত্তর ভারতের বিহার, পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের ১৫টি জেলা নিয়ে ঝারখণ্ড রাজ্যের দাবীতে চলছে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। বন্ধ–হরতাল ও সন্ত্রাসী ঘটনায় বেললাইন, ব্রিজ, রাস্তা ও কয়লা খনি বন্ধ হচ্ছে অহরহ। একই প্রক্রিয়ায় গুর্খা নেতা সুভাস ঘিসিং এর নেতৃত্বে গুর্খারা পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকর স্থান দার্জিলিং জেলায় চালাচ্ছে পৃথক গুর্খা রাজ্য গঠনের আন্দোলন। ত্রিপুরায় এ,টি, টি, এফ গেরিলারা ত্রিপুরাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রায়ই পুলিশ ও সৈন্যদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীনতাকামীদের গেরিলা আক্রমণের জন্য মনিপুর ও নাগাল্যাণ্ড পার্বত্যরাজ্য দু'টির পরিস্থিতিও বেশ উত্তপ্ত। তামিলনাড়ুতে তামিল সশস্ত্র গেরিলাদের তৎপরতার জন্য সেখানের জন জীবনও প্রায়ই অচল হয়ে পড়ছে।

ভারতের প্রাণ ও সবচেয়ে বেশী লোক অধ্যুষিত (১৮ কোটি) ইউ, পিতেও একটি নতুন প্রজাতন্ত্রের আন্দোলন চলছে। ইউ, পির ৮টি জেলা, আলমুড়া, নৈনিতাল, পতুরাঘর, চামুলী, দাহরাদুন, উত্তর কাশী ও পুরা গাঢ়ওয়াল নিয়ে এ নতুন প্রজাতন্ত্র গঠনের দাবী উঠেছে। মজার ব্যাপার, ইউ, পির বিজেপি সরকার [বর্তমানে বরখাস্তকৃত] কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনঠাসা করার জন্য এই আলগ প্রজাতন্ত্রের দাবী মেনে নিয়ে প্রজাতান্ত্রিক এসেম্বিলিতে একটি বিল পাশ করে নেয়। হিন্দু প্রধান হরিয়ানা ও শিখ প্রধান অঞ্জলের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সম্পর্ক, করনাটক ও তামিল নাড়ু রাজ্যের মধ্যে কাবেরী নদীর পানি বন্টন নিয়ে তিক্ত উত্তেজনাকর সম্পর্ক ভারতীয় রাষ্ট্র নায়কদের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে তুলেছে। তারা আজ দিশেহারা। সমগ্র ভারত খুঁজেও বিচ্ছিন্নতা নিরাময়ের তারা কোন মহৌষধ খুজে পাচ্ছে না। ভারতের এই দুর্দিনে তার সাথে গলাগলি বাঁধতে এসেছে বিশ্ব বেনিয়ার জাত আমেরিকা। সোভিয়েতের পতনের পূর্বেও এই আমেরিকা সোভিয়েতের সাথে গলায় গলায় ভাব গড়ে তুলেছিল। তলে তলে আসল কাজটি সেরে সরে পড়েছে। এখন তার টার্গেট চীন ও ভারত। বিশ্বে সে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার নিজের পছন্দমত ভৌগোলিক সীমারোখা নির্ধারণ করার এক খেলায় মেতে উঠেছে। এই চক্রান্তের অংশ হিসেবে সে সোভিয়েতের ন্যায় বন্ধুত্ব গড়ে তোলে ভিতর থেকে ভারতকেও ভাংতে চাচ্ছে। বাবরী মসজিদ সম্পর্কিত পরবর্তি পরিস্থিতির ওপর আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, সে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়ে একে একটা চূড়ান্ত রূপ দেয়ার মাধ্যমে ভারতকে ভাঙতে চায়।

বর্তমান ভারতীয় কংগ্রেস সরকার বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরবর্তিতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরপেক্ষভাবে দেশের স্বার্থ রক্ষার মনোবৃত্তি নিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করলে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে নির্মূল করতে ব্যার্থ হলে ভারতের পরিণতি তরান্বিত হবে। কেননা মুসলমানরা এমন একটা জাতি যাদের আঘাত করলে চুপ করে থাকে না বরং তাদের চেতনা আরও শানিত হয়। চকচকে, তকতকে মসজিদের চেয়ে জীর্ণ ও ভাঙ্গা মসজিদই তাদের বেশী শক্তি যোগায়। এজন্যই আফগানের, মধ্য এশিয়ার আলবেনিয়ার, পূর্ব ইউরোপের বন্ধ ও ভাঙ্গা মসজিদগুলো বেশী দিন বিরাণ হয়ে থাকে নি, মুসলমানরা বেশী দিন সমাজ গর্ভে মুখ লুকিয়ে থাকেনি। সুতরাং ভারতের মুসলমানদের ওপর যে আঘাত হানা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যদি তা' অব্যাহত থাকে তবে তারাও যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জেগে ওঠা মুসলমানদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতের বুকে আরও একটি স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবী করবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে? জাতিগত সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতা নামক রোগ যে ভাবে ভারতের গায়ে মহামারির মত ছড়িয়ে পড়েছে, যে কোন মুহূর্তে সকল অসন্তোষ একত্রিত হয়ে দৈত্যের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতের মান–চিত্র পাল্টে দেবে না এমন আশঙ্কা কি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায়?

বাংগালী জাতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃত ইতিহাস

ফজলুল করীম যশোরী

ভাষা মানবীয় সত্ত্বার সহজাত বৈশিষ্ট্য। ভাষার কারণেই মানুষ অনান্য প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এক কথায় মুখ্যত ভাষার কারণেই মানুষকে মানুষ বলা হয়।

আর ভাষা হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক মনের ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত মুখ নিঃসৃত শব্দ সমূহের প্রয়োগ পদ্ধতির নাম মাত্র। তাই যে জনগোষ্ঠির মানুষ যে ধরণের শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব আদান প্রদান করে থাকে সে জনগোষ্ঠির নামেই সে ভাষা পরিচিতি লাভ করে।

সে দিকে লক্ষ্য করলে বাংলা ভাষাটাও বাংগালী জাতির শত সহস্র বছরের মুখ নিঃসৃত শব্দ সমূহের বিশেষ রূপ মাত্র।

সুতরাং বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে বাংগালী জাতির জন্ম ও বিকাশের সঠিক ইতিহাস।

বস্তুতঃ বঙ্গ শব্দ থেকেই বাঙ্গালী বা বাংলা ইত্যাদি শব্দ সমূহের উৎপত্তি ঘটে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই বঙ্গ শব্দটি বঙ্গদেশে বা বাঙ্গালী জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জানা যায়, খৃষ্ট পূর্ব ৫/৬ হাজার বছর আগে বঙ্গ দেশ বলতে শিলং থেকে চাটগাঁও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে বুঝাতো। অর্থাৎ সরন্দ্বীপ (সিংহল), কনোজ ও কাশ্মীরের পূর্ব, হিমালয়ের উততুঙ্গ শৃঙ্গমালার দক্ষিণ, শিলং, কামরু (কামরূপ), কুমিল্লা (ত্রিপুরা) এবং চাটগাঁও ও আরাকানের কতেকাংশসহ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাংলাদেশের সীমানা।

ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, তখন এদেশে বর্তমানের ন্যায় নদ-নদী ও খাল বিলের এত আধিক্য ছিল না পরবর্তীতে সামুদ্রিক ভাঙ্গন ও ভাঙ্গন পরবর্তী উ ৎক্ষেপনজনিতকারণে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের ভূমি ভাঙ্গা। তৎকালে বাংলাদেশের পশ্চিমে হিমালয়ের প্রান্তবর্তী শিলং থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমভূমি ছড়া সবটুকুই ছিল সমুদ্র এবং তা বঙ্গোপসাগর বলেই খ্যাত ছিল।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাযক হউ, ইন, চুয়াং বাংলাদেশকে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুরানে উল্লেখ আছে "আর্যাবর্তের পূর্ব সীমায় যবনদেশ অবস্থিত। এককালে কমলাঙ্ক—কামলাঙ্কা—কুমিল্লা ইত্যাদি জনপদসমূহ সমুদ্রের অঙ্কশায়ী ছিল।" (রাজমালা পৃঃ ৮৩-৮৮)

যবন বলতে তারা যে আরব জনগোষ্ঠি-বিশেষ করে বিদেশাগত মুসলিমদের বুঝিয়ে থাকে তা বলা বাহুল্য।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি তার পেরিপ্লার্স আরসী নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "গংগা নদীর শেষভাগ যে এলাকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে সে এলাকাই গংরিড়ীরবঙ্গরাজ্য।"

হাজার হাজার বছর পূর্বের গ্রীক পণ্ডিত গেমাস্তিনিস লিখেছেন, "বহু জাতির বাসভূমি ভারতে গংরিড়ীরাই ছিল সর্ব শ্রেষ্ঠ। তারা এতই শক্তিশালী ছিল যে, কোন রাজশক্তিই তাদেরকে আক্রমণ করতে সাহস পেত না। এছাড়া প্লাতর্ক ও টলেমি প্রমুখের রচনাতেও এর সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে যে গংরিড়ী জাতির কথা হয়েছে তা মূলতঃ বংদ্রাবিড়ী শব্দেরই বিকৃত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বস্তুতঃ বঙ্গ ও দ্রাবিড় সভ্যতা যে একই বৃক্ষের দুটি শাখার ন্যায় একই জনগোষ্ঠির দুটি অভিন্ন শাখা তার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, এই উভয় জনগোষ্ঠী হযরত নূহ (আঃ) এর দু' সন্তান হাম ও শামের বংশধর।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত গোলাম হোসেন সলীম-এর ফারসী 'রিয়াজ আসসালাতিন'—এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে আকবর উদ্দিন কর্তৃক বঙ্গানুবাদকৃত বাংলার ইতিহাস নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছেঃ নূহ আঃ এর পুত্র হাম তাঁর পিতার অনুমতি অনুযায়ী পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে মানব বসতি জন্য মনস্থ করেন। সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য তিনি তাঁর পুত্রদের দিকে দিকে মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। হামের প্রথম পুত্র হিন্দ, দ্বিতীয় পুত্র সিন্ধ, তৃতীয় পুত্র হাবাম, চতুর্থ পুত্র জানায, পঞ্চম বার্বার ও ষষ্ঠ নিউবাহ প্রমুখ যে সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে সেসব অঞ্চলের নাম তাঁদের নামানুসারে রাখা হয়। জেষ্ঠ পুত্র হিন্দ হিন্দুস্তানে আসার দরুন এই অঞ্চলের নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয়। হিন্দের চাঁর পুত্রঃ বঙ্গ, দবিন, নাহার ও দল। হিন্দের সন্তানরা বাংলায় উপনিবেশন স্থাপন করেন।" আদিতে বাংলার নাম ছিল বং। এর সাথে "আল" যোগ হওয়ায় এর নাম বঙ্গাল বা বাংলা হয়। বাংলা ভাষার ইতিহাস, (আব্দুল আউআল-পৃঃ ৩)

আইন-ই আকবরীতে আবুল ফজল লিখেছেন বঙ্গ ও বাংগালা একই অর্থ বহন করে। মূলে নামটি ছিল বঙ্গ, এর শাসন কর্তারা দশ ফুট উঁচু বিশ ফুট চওড়া বাঁধ তৈরী করেছিলেন; এ থেকে বঙ্গাল বা বাংলা নামটির প্রচলিত হয়। (ঐ পৃঃ ৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বাংগালী জনগোষ্ঠির উৎস এবং বাংলা নাম করণের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল। এবার দ্রাবিড় জনগোষ্ঠির আলোচনা করা যাক, তাহলে বংদ্রাবিড়ী ঐক্যের সূত্র বের করা সহজ হবে।

হযরত নূহ আঃ এর পুত্র সাম। সামের পুত্র আরফাখশাজ, আলফাখশাজের পুত্র শালেখ। শালেখের পুত্র আবির। আবিরের পুত্র য়্যাকতান। য়্যাকতানের পুত্র আবুফীর।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই আবুফীর প্রথমে সিন্ধু তীরে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশ থেকেই সিন্ধু এলাকায় সর্ব প্রথম জনবসতি গড়ে উঠে। আবুফীর প্রচলিত রীতি অনুসারে নিজ এলাকার ও গোষ্ঠীর নাম নির্ধারণ করে ছিলেন। আবু ফীরের ভাই 'য়্যারব' সুমের অঞ্চলে গিয়ে সেখানে আরব গোষ্ঠী ও আরবী ভাষার ভিত্তি রচনা করেন। আর এই য়্যারবই হলেন সুমের সভ্যতা ও আরবী ভাষার জন্মদাতা।

সুতরাং আবুফীরের ভাই য়্যারবের ভাষার সাথে তার ভাষার সাদৃশ্য থাকবে তা আর খুলে বলার প্রয়োজন হয়না। অবশ্য পরে ভৌগলিক পার্থক্যের ফলে উভয়ের ভাষার মধ্যে স্বাভাবিক কারণে কিছুটা হেরফের হয়েছে বটে তবে প্রাথমিক কালে যে উভয়ের ভাষা প্রায় একই ছিল তা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে পরে আলোচনা কর।

আরবীতে দার অর্থ ঘর বা আবাসস্থল। আবুফীর ভারতে এসে তাঁর নিজের নামে অথবা তাঁর দাদা আবিরের নামে নিজ এলাকার নাম দিলেন দার আবুফীর অথবা নিজের নামে দার আবির। আর দার আবুফীর অথবা দারআবিব শব্দটিই পরে বিবর্তনের মাধ্যমে দ্রাবিড় শব্দে রূপান্তরিত হয়। এই দ্রাবিড়রাই 'হরপ্পা মহেনজোদারো'সহ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই পর্যন্ত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে এই হরপ্পা ও মহেনজোদারো সভ্যতা বিশ্বের আদিতম জন বসতি এবং প্রাথমিককালের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা বলেই প্রমাণিত হয়।

এই দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে উক্ত অঞ্চল তথা ভারত বর্ষে মানব জাতির আদি নিবাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রচলিত ধরণা মতে মধ্যপ্রাচ্যকেই মানব জাতির আদি নিবাস বলে উল্লেখ করা হয়। তৎকালীন ভৌগলিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর আজ একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তৎকালীন ভারতবর্ষ ওতপ্রোতভাবে একই ভৌগলিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এর বেহেস্ত থেকে অবতরণের পরবর্তী ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে একথাই সাক্ষ্য দেয়।

হযরত আদম (আঃ) যে বেহেস্ত থেকে সর্ব প্রথম এই ভারত বর্ষে সরন্ধিপ অঞ্চলে অবতরণ করেছিলেন তা এক প্রকার সর্বজন স্বীকৃত সত্য এবং সরন্ধিপ এককালে আমাদের এই বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাঠকদের অবগতির জন্য ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক মাওলানা শামসনবীদ ওসমানী সাহেবের গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলোঃ হযরত আদম (আঃ)-এর ভারত বর্ষে অবতরন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "শ্রীলংকার সরন্ধিপ পর্বতে বহু দীর্ঘ একটি পদ চিহ্নের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। মুসলমান ও খৃষ্টানরা ওটাকে হযরত আদম (আঃ)-এর পদচিহ্ন বলে ধারণা করে থাকে এবং হিন্দুরা ওটাকে তাদের দেবতা শিও জীর পদচিহ্ন বলে ধারণা করে আর বৌদ্ধদের ধারণা ওটা গৌতমবুদ্ধেরপদচিহ্ন।

হাদীস ও তফসীরের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আঃ) বেহেস্ত থেকে সরাসরি হিন্দুস্থানে অবতরণ করেন। ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতেম এবং হাকেম এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আঃ) হিন্দুস্থানের যে স্থানটিতে পদাপর্ণ করেন তার নাম হচ্ছে দাজনা সম্ভবতঃ এ দাজনাই হচ্ছে দখিণা অথবা দক্ষিণ যা বর্তমানে দক্ষিণ ভারত নামে প্রসিদ্ধ, (আরব হিন্দকে তায়াল্লুকাত। সৈয়দ সুলাইমান নদবী পৃঃ ১-২)

এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আঃ)-এর ঐতিহাসিক চুটিও ছিল হিন্দুস্থানে অবস্থিত (তাফসীরে ফাতহুল কবীর, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৭৪। আগার আবভী না জাগোতো ---পৃঃ ৫১)

হযরত নূহ (আঃ) হিন্দুস্থানে কুরআন মজিদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তুফানের পর হযরত নূহ (আঃ)-এর কিস্তি ইরাকের কুর্দীস্তানের অন্তর্গত জুদি পাহাড়ে আটকে যায়। বাইবেল থেকে জানা যায়, ইরারাত পাহাড়ের তাঁর কিস্তি আটকে যায়। মূলতঃ জুড়ি পাহাড় ও ইরারাত একই পাহাড়ের দুই শীর্ষের নাম। কিন্তু তুফানের পূর্বে ৬০০ বছর পর্যন্ত এবং তুফানের পরবর্তী সময়ে তিনি কোন কোন এলাকায় দ্বীন প্রচার করেছিলেন এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ সম্পূর্ণ নীরব। তাওরাত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায়, তুফানের পর সাথীদের নিয়ে তিনি বাবেল শহরে একত্রিত হন এবং সেখানে থেকে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

"বাবেলকে বাবেল এজন্য বলা হয় যে, খোদাপাক সেখানে সমস্ত ভাষাভাষীকে মিলিত করে ছিলেন। (তওলার কিতাবু পয়দায়েমঃ ৯/১১)

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, "যখন আমার হুকুম আসল এবং তন্দুর থেকে পানি উথিত হওয়া শুরু করল, তখন আমি বললাম যে, এই কিস্তিতে প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক এক জোড়া তুলে নাও।" (হুদঃ ৪০)

তন্দুর শব্দটি আরবী শব্দ নয়-ফারসী। যার অর্থ উনুন। আবার কেউ কেউ তন্দুর বা

(৩০পৃঃ দেখুন)

৪৭০০০ হাজার মুসলমানের বাধ্যতামূলক হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ

শাব্বীর আহমাদ শিবলী

ভরত থেকে এক হৃদয় বিদারক সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। রাজেস্তানের এক এলাকায় প্রায় অর্ধলক্ষ মুসলমান হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। এক আল্লাহ্‌র সামনে শীর অবনত করার পরিবর্তে আজ তারা অসংখ্য দেবতার সম্মুখে মাথা ঠুকছে। কিছুদিন পূর্বেও যেখানে দূর থেকে দেখা যেত মসজিদের উঁচু উঁচু মীনার আর ভেসে আসত আযানের সুমধুর আহবান আজ সেখান থেকে শুনা যায় শাঙ্খের ধ্বনী এবং বেদমন্ত্রের আওয়াজ। আর সে সকল মুরতাদ এখন বিবাহ-শাদীর পবিত্র জীবন ত্যাগ করে শিব লিঙ্গ পূজায় লিপ্ত।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মৃতদেহ গুলোকে সমাধীস্থকরার পরিবর্তে আজ অগ্নীদ্বারা ভস্ম করা হচ্ছে। কালকেও যে আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান নামে নিজের পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করতো আজ তাকে ডাকা হচ্ছে ভগবান দাস, রামদয়াল প্রভৃতি নামে।

আজ থেকে দশ বছর পূর্বের কথা। বিশ্ব হিন্দু-পরিষদ নামে একটি সংগঠন যে কোন মূল্যে অন্য ধর্মালম্বী লোকদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার ঘোষণা দিয়ে এ উদ্দেশ্যে মাঠে নামে এবং এ পর্যন্ত তারা ৪৬,৭৭৭ মুসলমান এবং ২০০০ খৃষ্টানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সংখ্যাটি শুধুমাত্র রাজিস্তানের চারটি জেলার। এসব এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলোতেও তাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়।

উইক্‌লি অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টার জনাব সুখমানী সিং রাজস্থানের ঐ সকল এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং তার স্বচক্ষে দেখা এ রিপোর্টটি পাঠকদের অবগতির জন্যে তুলে ধরা হচ্ছে। এ রিপোর্টটি থেকে মুসলিম সমাজের শিক্ষা নেয়া উচিত বিশেষ করে ঐ সকল উলামাদের যারা বাতিলের মুকাবিলায় হাতিয়ার রেখে দিয়ে আপোষে দন্ধে লিপ্ত রয়েছে। রাজস্থানের আকাশ বাতাস চিৎকার করে ফরিয়াদ করছে, হে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উত্তরসূরী উম্মতে মোহাম্মদী, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার পায়তারা চলছে, তোমরা আজ কোথায়---?

রাজস্থানের "পালী" জেলার অন্তর্ভুক্ত "কোলপুরা" বস্তিতে অবস্থিত সাদা ধবধবে একটি মন্দির। হিন্দুধর্ম গ্রহণকারী সরলমনা নির্বোধ লোকগুলো এ মন্দিরে রক্ষিত মূর্তিকে কৌতুহল ভরে দেখার জন্যে দল বেধে আসতে থাকে। আরাওয়ালীর বিশুষ্ক এবং উলঙ্গ পাহাড়ের গা ঘেষে অবস্থিত এলাকাটিতে একটি নতুন মন্দিরের আবির্ভাব সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।

ইতিহাস মতে আযমীর, আদীপুরা, পালী এবং কুলোয়ার জেলার স্থানীয় লোকেরা বিশেষ ভাবেই সহনশীল ও অতিথি পরায়ন বলে খ্যাত। যুগ যুগ ধরে সুমলমান হিসাবে বসবাস করে আসছিল তারা। মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করণ, ইসলামী রীতি অনুযয়ী বিবাহ সাদী ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ সহ তারা মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করত। কিন্তু ঈদ ও শবে বরাতের ন্যায় হিন্দুদের হোলী (ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের এক বিশেষ অনুষ্ঠান) ও দেয়ালী উৎসবেও তারা অত্যান্ত উৎসাহের সাতে অংশ গ্রহণ করত বটে।

প্রচারনা ও ভীতি প্রদর্শন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশেষ পতাকা বাহী হলুদ রংগের জীপ এ সকল জেলার বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় এবং সন্ধ্যা হলে একটি ক্যাম্পে তারা অবস্থান নেয়। অতপর চলে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার অনুষ্ঠান। প্রথমে সরলমনা গ্রাম্যলোকদের দীর্ঘ তিন ঘন্টা ব্যাপী একটি ফিল্ম দেখানো হয়। গানে গানে মুখরিত এ ফিল্মটি কিংবদন্তীর বাদশাহ পৃথি রাজের জীবনী নিয়ে রচিত। ফিল্মটি চলা কালে উপস্থিত দর্শকদেরকে এ ধারণা দেয়া হয় যে, আমরা ঐ বাদশাহর উত্তরসূরী, যার মৃত দেহকে প্রজ্জলিত অগ্নিতে নৈবেদ্য করা হয়েছিল। এমনি নানা পন্থায় সরলমনা লোকদের আবেগ অনুভূতিতে ঢেউ তোলার পর শুরু হয় দীক্ষা গ্রহণের প্রথম পাঠ—অগ্নি শপথ অনুষ্ঠান (আগুনে হাত রেখে শপথ নামা পাঠ)। এভাবে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সর্ব প্রকার চেষ্টা চালানোর পর সবশেষে ধমক দিয়ে বলা হয় যে, "কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের ন্যায় কোন পরিস্থিতি যদি এখানে সৃষ্টি হয় তাহলে মনে রেখো, তোমরা কেউ বাঁচতে পারবে না।"। এইরূপ প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্রের বিষফলে আজ সেখানে নিরাপত্তা ও শান্তি অনুপস্থিত। সমাজে পুতিগন্ধময় পরিবেশ বিরাজিত। সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতা ও সুসম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। যার ফলে কিছুদিনের ব্যাবধানে ইসলামে বিশ্বাসী মুসলিম ঘরের এক যুবতী হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার পর বলেছে, "এখন আমাদের প্রভুর আদেশ মতে, ঈদ উৎসব পালন করা পাপের কাজ"। এ বাদামী দেবী রামপুরার পাঁচটি বস্তীর ২০০০ মানুষের একজন। এদেরকে ১৯৭৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক অনুষ্ঠানে ইসলাম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেছিল। ২৮ বছরের এক যুবক পরেশ হাকিম সিংও তাদের একজন, সে এখন বলছে "মেয়েদের কোন ধর্ম কাজ নেই।" তার মুসলমানী নাম ছিল হাকিম এবং পিতার নাম হুসাইন। কিন্তু

সেই হাকিম আজ কোন মুসলমানের ঘরে পানিটুকু পান করতেও নারাজ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্ম-কর্তাদের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে সীমাহীন খুশীর বিষয় যে, ভারতকে পরিপূর্ণ রূপে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার লক্ষে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সফলতার সাথে অগ্রসরমান।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ কর্মীদের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আর এস, এস, এর প্রচারক উমা শঙ্করশর্মা আনন্দ ও খুশীর অতিশয্যে বলেন, "প্রথম প্রথম যখন আমরা এসকল এলাকায় প্রবেশ করি তখন এলাকার লোকেরা বলত "তোমরা গাধাকে গোসল করায়ে খোদা বানিয়ে ফেল কিভাবে? তোমরা আবার আমাদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে চাচ্ছ।" কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ শর্মা মহাশয়দের জন্য বেশী কিছু নয়, কেননা শুধু দশ বছরে তারা ৪৬৭৭৭ মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া তারা এ এলাকার প্রায় আরও ২০০০ খৃষ্টানকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেছে।

ষড়যন্ত্রের জাল

কোন অঞ্চলের লোকের ধর্মীয় পরিবর্তন সাধন এক দিনে সম্ভব হয় না বরং মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে চলে এর পেছনে ষড়যন্ত্র। এ ছাড়া মোটা অংকের অর্থও ব্যয় করা হয় এর পেছনে।। যা দেয়া হয় ধর্মান্তরীত লোকদের হাতে। তাদের ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের পেছনও দশ থেকে বার হাজার টাকা খরচ হয়ে থাকে এবং এদের জন্য প্রতিটি মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রত্যেক কর্মীর জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা তো রয়েছেই।

সরলমনা গ্রামবাসীর চিন্তা-ধারা ও মস্তিষ্ক ধোলাই করার জন্য এ পরিষদ স্থানে স্থানে তৈরী করেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তন্মধ্যে হাসপাতাল এবং শিশুসদন কেন্দ্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শুধু হিন্দু ধর্মের শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া অল্প বয়স্ক যুবকদের জন্য হোষ্টেল তৈরী করা হয়েছে যেখানে তাদেরকে হিন্দু ধর্মের কাহিনী তো শুনান হয়ই সাথে সাথে রয়েছে যৌন ক্ষুধা নিবারণের উপাদানও।

আজমীর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে বেওয়ার নামক একটি শিল্পনগরী আছে, সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি অফিস রয়েছে। সে অফিসে এমন একটি ডায়রী আছে যে ডায়রীতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী সকল লোকের বিস্তারিত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা হয়। যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাষায় তাদেরকে বলা হয়, "তারা গৃহে ফিরে এসেছে।"

ধর্মান্তরীত করার নিয়মঃ

হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ খুবই দ্রুততার সাথে চলছে এবং ধর্মান্তরের ছোট কোন অনুষ্ঠানেও হিন্দু সংগঠনগুলো ১০০০ হাজার টাকার ব্যয় করে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তাদের নিকট থেকে প্রথমে একটি ফরমে স্বাক্ষর নেয়া হয়, এবং তাকে স্বীকার করতে হয় যে, আজ থেকে সে ইস-লামী সকল আচার অনুষ্ঠান বর্জন করবে। এর কিছু দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরের এক বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। তাদের এ প্রোগ্রাম সাধারণত রাতে খুবই সাবধানতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী সকলেই অগ্নিতে হাত রেখে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার নামা পাঠ করে থাকেঃ- আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যে, আমার বংশে এ পর্যন্ত যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত ছিল যথা ইসলামী নিয়মে বিবাহ করা, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা ইত্যাদি সকল কিছু পরিত্যাগ করব এবং আজ থেকে পরিপূর্ণরূপে হিন্দু প্রথা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব।"

এরপর তাদের বাহুতে সুতা বেধে দেয়া হয় এবং কপালে তিলক চিহ্ন দেয়া হয় আর পান করান হয় গঙ্গার জল এবং মুসলমানী নাম পরিবর্তণ করে রাখা হয় হিন্দু নাম। এমনিভাবে সমাপ্ত হয় তাদের ধর্মান্তরীত করণ অনুষ্ঠান। এক অনুষ্ঠানে একই সাথে দেড় থেকে দুই শত লোক হিন্দু ধর্মে প্রবিষ্ট হয়।

অবশ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের এ ঘৃণ্য প্রচারণার প্রত্যেক অভিযানে স্বাভাবিকভাবে সফল হাতে পারছে না। কখনো কখনো তাদেরকে বাধার সম্মুখীনও হতে হয়। এর দূরবর্তী পাহাড়ী এলাকার বস্তীগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ এলাকায় ১৯৮৫ সালে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হলে স্থানীয় মুসলমান যুবকরা বোমা মেরে মন্দির উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। যার ফলে তৎক্ষণাত আর এস, এস, এর তিনশত সশস্ত্র জোয়ান এসে উপস্থিত হয় এবং পরবর্তীতে অস্ত্রের মহড়ার মাধ্যমে সে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পাহাড়ের উপর অবস্থিত সে মন্দিরেরর চূড়াটি আজ বহুদূর থেকে দৃষ্টি গোচর হয়। সে মন্দিরের পাদদেশে রয়েছে একটি মাদ্রাসা। এলাকার শুভ্রকেশওয়ালা এক বৃদ্ধ সাপ্তাহে একদিন এলাকার মহিলাদেরকে হিন্দুয়ানী পুজা পাঠ শিক্ষা দিত এবং ঝার ফুকের মাধ্যমে গরীব লোকদেরকে চিকিৎসা করে আসছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, "পূর্বের তুলনায় আজকের পরিস্থিতিতে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে এ এলাকার কেউ মন্দিরে আসতে সাহস পেত না। কিন্তু আজ এখানের মৌলভী সাহেবরা মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়েছে। যে মাদ্রাসায় এক সময় ৩০/৪০ জন মুসলিম ছেলে পড়া লেখা করত এখন সেখানে একজন ছাত্রও নেই, আছে শুধু স্মৃতি হিসেবে মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ।"

গৃহ যুদ্ধ

কোন একটি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরীত করা হয়ত সহজ কিন্তু তার পর? তার পর তাদের সামনে উপস্থিত হয় অসংখ্য বিপদ।

এ ধরণের ধর্মান্তরীত লোকদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে দেখা দেয় সব চেয়ে বড় সমস্যা। এহেন পরিস্থিতিতে নতুন ধর্ম গ্রহণকারী প্রায় সকলকেই সমাজে অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে বসবাস করতে হয়। এ বিষয়ে এক বৃদ্ধের মুখে শুনুন, "ধর্মান্তরীত হওয়ার পর আমার এবং আত্মীয়স্বজনের মাঝে এক দূরত্বের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহ সাদীর সুদৃঢ় বন্ধনে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। আরও বহু শ্রমিক ধর্মান্তরীত হবার পর এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানায়। সে বলেছে "স্বীয় ধর্ম ত্যাগে আমার দাম্পত্য জীবনে এক বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে"। সে অত্যন্ত হতাশা ও ব্যাথার সুরে বলেছে, "যখন আমি স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করছিলাম তখন আমার স্ত্রী সরাসরি তা অস্বীকার করে চলে যায় এবং এখনও সে স্বীয় অবস্থার উপর বহাল রয়েছে।"

তিন বছরের এক শিশুর কথাঃ যার স্নেহময়ী চেহারা থেকে এখনো মুসল-মানিত্বের নিশানা মুছেনি বিভিন্ন সমস্যায় আজ সে জর্জরিত। সহপাঠি মুসলিম ছেলেদের সাথে তার সর্বদা ঝগড়া হচ্ছে।

পালী নামক গ্রামের নয়া বাড়ীর তিনটি পরিবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ বেছে নিয়েছে। ৮৯ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি যার গ্রীবাদেশে লটকানো হিন্দুয়ানী মালা, সে স্বীয় ধর্ম ত্যাগের পর কতিপয় তীক্ত ঘটনার সম্মুখিন হওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, ধর্ম ত্যাগের পর বস্তীর মুসলমানরা আমাকে বাড়ীর ওপর দিয়ে হাটা চলা করা এবংকূপ থেকে পানি নেয়ার ব্যাপারে এক নির্দিষ্ট সময় বেধে দিয়েছে। হোলী উৎসবের সময় এক রক্তক্ষয়ী খুনাখুনী হলো সেখানে। তাতে আমার ভাতিজা নিহত হয় এবং আমি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হই।"

শত সমস্যার মধ্য দিয়ে এক বছর পর এই তি'নটি পরিবারের লোকেরা নিজ ভিটাবাড়ী ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এরপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সশস্ত্র কর্মীরা সেখানে এসে বিরান হয়ে যাওয়া বস্তীগুলোকে দ্বিতীয় বার আবাদ শুরু করে এবং গ্রামবাসী মুসলমানদেরকে এই বলে হুশিয়ার করে দেয় যে, হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী পরিবারের উপর যারা হাত উঠাবে তাদের রক্ষা নেই। সেখানকার আইনজীবীরাও এসব লোকের পক্ষ নেয় এবং তারা স্থানীয় আদালতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এর পর হিন্দু ধর্ম গ্রহনকারীদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিশেষভাবে লক্ষ দেয় এমনকি তাদের জন্য আলাদা কূপ খনন করে দেয়া হয়। বলুন, কোন সমাজ কি এভাবে টিকতে পারে?

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক আবেগপ্রবন উদ্যমী কর্মী রাম সিং বলেন যে, আমাদের ক্ষমতা প্রকাশিত হবার পর এখন মুসল-মানরা বুঝে নিয়েছে যে, তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারীদের সাথে যেরূপ আচরণ করবে তাদের সাথেও ঠিক সেরূপ আচরণ করা হবে।" বৃদ্ধ কবির সিং বলেন "আমার ভাতিজার মৃত্যুর পর তার অন্তেষ্টিক্রীয়ার সময় এত পরিমাণ হিন্দু উপস্থিত হয় যে, আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি যে, সহমর্মিতার নামে এবার আমাকেও হত্যা না করে। তাদের জংগীভাব দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই।

এমন একটি এলাকায় আজ এসব কিছু হচ্ছে যেখানে সর্বদা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও হিন্দু-মুসলমান আপোষে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছিল। আজমীরের ন্যায় এসব এলাকার মুসল-মানরাও স্বীয় ঈমান আকিদা নিয়ে নিরাপদে ছিল। আজমীর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে পেশকার হিন্দু নেতাদের কেন্দ্র অবস্থিত। অথচ আজমীর মুসলমানদের কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। একজন সরকারী অফিসার পিয়ারমুহীন তরপাট বলেন, "পুরো অযোধ্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ এখানে (আজমীর) আজ পর্যন্ত এমন কোন লক্ষনই পরিলক্ষিত হয়নি।"

আলেম সমাজের নিরবতা

কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের কর্তৃক এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও রাজস্থানের আলেমগণ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় বরং এ বিপুল সংখ্যক মুসলমান হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বাস্তবতা উনারা স্বীকারই করছেন না। আজমীর শরীফের মুসলিম নেতা সাইয়্যেদ নবী হোসাইনের সাথে এ ব্যাপারে সাক্ষাত কলে তিনি বলেন, "শুধু নামে মাত্র মুসলমান যারা তারাই স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করছে। তারা জানেই না ইসলাম কি জিনিস। কেননা গ্রামাঞ্চলে ইসলামের না কোন শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে না তাবলীগের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পুরা হিন্দুস্থানকে আয়ত্তে আনতে চাচ্ছে সত্য কিন্তু সফল হতে পারবে না।" এটা কি কোন বিজ্ঞোচিত কথা?

অপর দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা বলছে যে, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের ঐ সব মোল্লা-মৌলভী যারা আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে অর্থ পাচ্ছে এবং গ্রামের দিকে আসার চেষ্টা করছে তাদের প্রচারণা থেকে এলাকার লোকদেরকে মুসলমান হওয়ার থেকে বাচানোর মানসে প্রয়োজনে ঐ সব মোল্লাদেরকেও হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করো হবো" তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব দ্রুত কাজ চলছে। এ ছাড়া মহা রাষ্ট্র এবং ইউ,পিতে বহু লোক এমনিতেই নাকি ইসলাম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছে।

যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তাদেরকে হিন্দুয়ানী প্রথা। প্রচলন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হয়। হিন্দু পরিষদ এ সকল লোকদের সম্মান প্রদর্শনার্থে এখন এমন সব উৎসব তারা উদ্‌যাপন করছে যা ইতিপূর্বে

(৩৮পৃঃ দেখুন)

হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)–এর মনোনীত কাহিনী

একজন মুরীদের স্বপ্নঃ

জনৈক মুরীদ তার পীরকে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার আংগুলগুলো মধু মাখা এবং আমার আংগুলগুলো ময়লা ভরা।

অপেক্ষা না করে পীর সাহেব তাকে বল্লেন, ঠিক দেখেছো, আমি তো এমনই আর তুমি তো অমন (তোমার আত্মা যে ক্লেদাক্ত এ কথা তারই ইংগিত বহন করে)।

মুরীদ বল্লেন, হুযুর আমার স্বপ্ন বলা এখনও শেষ হয়নি। অতপর দেখি যে, আপনি আমার ময়লাভরা ক্লেদাক্ত আংগুলগুলো চেটে খাচ্ছেন এবং আমি আপনার মধুমাখা আংগুলগুলো চুষে খাচ্ছি।

একথা শুনে পীর সাহেব রাগতঃস্বরে মুরীদকে বল্লেন, খবীস, বের হও এখান থেকে!

মুরীদ পীর সাহেবকে বল্লেন, হুযুর, বের হয়ে তো যাব কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি। যা দেখেছি হুবহু তাই বলেছি।

ইব্রাহীম ইবনে আদহামের ঘটনাঃ

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বাদশাহী ত্যাগ করে লোকালয় ছেড়ে নির্জনে চলে গেলে দেশের মন্ত্রী পরিষদ এক জরুরী সভা ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, যে কোনভাবে তাঁকে রাজত্ব পরিচালানর জন্য ফিরিয়ে আনতে হবে। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে গেলেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি যেয়ে দেখেন, সম্রাট ইব্রাহীম ইবনে আদহাম ধুলো ময়লা শরীরে বসে আছেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বল্লেন, হুযূর! আপনার অনুপস্থিতিতে রাজত্বে চরম অরাজকতা ও অস্থিতিশীরতা বিরাজ করছে। হুযূর! আপনি (দেশ ও জনগণের স্বার্থে) পুনরায় রাজদণ্ড হাতে তুলে নিন। তিনি তাকে বল্লেন, এই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য তোমাদের জন্য প্রযোজ্য। আমি তোমাদের মংগল কামনা করি। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আলাদা এক বৃহৎ সাম্রাজ্য দান করেছেন। একথা বলে তিনি তাঁর ছেড়া ময়লা পোষাকের মধ্য থেকে একটা সুঁচ বের করে নদীতে ছুড়ে মারেন। অতপর মন্ত্রীকে বল্লেন, আমার এই সুঁচটি নদী থেকে তুলে দাও। মন্ত্রী অসংখ্য লোককে সুঁচটি তুলে আনার জন্য নদীতে নামিয়ে দেন। বিরাট নদী বক্ষ থেকে হাজার লোকে ডুবিয়েও সুঁচ তুলে আনা সম্ভব কি? মন্ত্রী সাহেব সুঁচ তুলে আনতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি মন্ত্রীকে বল্লেন, আচ্ছা এবার আমার রাজত্ব অবলোকন কর! এ কথা বলে তিনি সব মাছকে ডেকে বল্লেন, হে মৎসদল! আমার সুঁচটি তুলে দাও। হাজার হাজার মাছের কেউ স্বর্ণের সুচ, কেউ রৌপ্যের সুচ নিয়ে হাজির হয়। তিনি তাদেরকে বল্লেন, এসব নয়, আমার লোহার সুঁচটি খুঁজে আনো। এরই মধ্যে একটি মাছ তাঁর লোহার সুঁচটি তুলে এনে উপস্থিত হয়। তিনি তাঁর সুঁচটি মাছটির মুখ থেকে তুলে এনে মন্ত্রীর সামনে রেখে বল্লেন, দেখেছো এবার আমার রাজত্ব! ফিরে যাও এবং তোমরা তোমাদের রাজত্ব ও প্রজা পরিষদ নিয়ে সুখে থাক।

বক্তাদের গল্প রাজী

অনেকবক্তা বক্তৃতা করার সময় বহু অলীক কাহিনী ফেঁদে বসেন। রাসুল (সাঃ)–এর সম্পর্কেও তারা এরূপ অযৌক্তিক বেবুনিয়াদ ঘটনার অবতারণা করেন, যা দুঃখ জনক।

জনৈক বক্তা সাহেব কোন এক বক্তৃতায় গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রাহঃ) সম্পর্কে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনৈকা বৃদ্ধা গাউসুল আজমের নিকট এসে তাঁকে অনুরোধ করেন, আমার ছেলেটি মারা গেছে তাকে জীবিত করে দিন। তিনি বল্লেন, সে জীবিত হবে না। তার হায়াত শেষ হয়ে গেছে বলে সে মরে গেছে।

বৃদ্ধা বল্লেন, তার হায়াত শেষ না হয়ে গেলে আপনার নিকট আসার কি প্রয়োজন ছিলো? হায়াত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে বলেই তো তাকে জীবিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আঃ কাদের জেলানী (রাহঃ) এ ব্যাপারে আল্লাহ্র দরবারে দরখাস্ত করলে সেখান থেকেও এই কথা বলা হয় যে, সে আর জীবিত হবে না। তার বয়স শেষ হয়ে গিয়েছিলো বলে মৃত্যুবরণ করেছে। তবুও তিনি তাকে পূণর্বার জীবিত করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। এদিকে বৃদ্ধাও কোন কথা শুনতে রাজি নয়। সে তার পুত্রকে জীবিত দেখতে চায়।

কোন উপায় না দেখে গাউসুল আজম আজরাইলের হাত থেকে মৃতদেহসমূহের রুহ–এর থলেটি ছিনিয়ে আনেন এবং সেটি খুলে ফেলেন। ফলে সব রূহগুলো একে একে উড়ে যেতে থাকে এবং সকল মৃত্যু ব্যক্তি পুণর্জীবন লাভ করে।

অতপর তিনি আজরাইলকে বলেন, একটি রূহ চেয়েছিলাম, দাওনি বলে এরূপ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। এ ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না।

এক পর্যায়ে আজরাইল (আঃ) আল্লাহ্র নিকট এ অঘটন সম্পর্কে অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তাঁকে বলেন, আমার বন্ধু একটা কাজ করে ফেলেছে আমি তাকে কি বলতে

পারি। সে যা করেছে ঠিকই আছে।

সুপ্রিয় পাঠক! একেই বলে আজগুবি-অলীক কাহিনী।

দৃষ্টি উন্মোচন

একজন প্রগতিবাদী মুক্ত মনের কবির কথা। তাঁর কথা ও কবিতার ভাষায় তাকে বুযুর্গ বলে মনে হয়।

জনৈক ব্যক্তি তার কবিতা পড়ে তার নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের জন্য কবির দেশ ইরানে রওয়ানা করেন। এসে দেখেন, ধারালো খুর দিয়ে নাপিত তার দাড়ি মুণ্ডাচ্ছে। এ ঘটনা দেখে আগন্তুক চিৎকার করে কবিকে বলেন, "আপনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন!"

জবাবে কবি বলেন, "দাড়ি মুণ্ডন করি বটে কিন্তু কারো মনে আঘাত দেই না। মহা পাপ হলো কারো মনে আঘাত দেয়া।"

তার একথার জবাবে আগন্তুক তাঁকে বল্লেনঃ "আরে আপনি তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মনে ব্যথা দিচ্ছেন।"

অর্থাৎ রাসূলুল্লা (সাঃ) যখন অবহিত হন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁর সুন্নাতের খেলাফ করছে তখন তিনি অবশ্যই ব্যথিত হন।

কথাটি কবির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি তার ভ্রান্তি বুঝতে পারেন, তাঁর আত্মদৃষ্টি উম্মোচিত হয় এবং তার মুখ দিয়ে কবিতার ভাষায় শতস্ফূর্ত উচ্চারিত হয়ঃ

জাঝাকাল্লাহু কে চশমাম বা জে করদি

মুরাবা জানে জাঁ হামরাজে করদি

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমি অন্ধ ছিলাম। আজ বুঝেছি, আমার কাজ দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হৃদয়ে অনেক ব্যাথা দিয়েছি।

বাদশাহ আলমগীর এবং এক ভণ্ড বহুরূপী

বাদশাহ আলগমীর (রাহঃ) তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন প্রজা সাধারণকে নিজ হাতে অর্থ দান করছিলেন। এক বহুরূপী লোক এসে দান গ্রহণের জন্য তাঁর নিকট হস্ত প্রসারিত করে। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর দ্বীনদার আলিম ছিলেন বিধায় ভাবছিলেন, একে দান করা মোটেই ঠিক হবে না। আবার রাজদরবারের নিয়ম অনুযায়ী তাকে সরাসরি না দেয়ার কথাও বলা যায় না। তাই তিনি তাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, ভালো লোকদেরকেই কেবল দান করা যায়, তোমাকে দান গ্রহণ করতে হলে তোমার বহুরূপী হিসেবে পরিচিত আদল খানা পাল্টাতে হবে।

একথার পরে সে পোষাক পালিয়ে আসলেও বাদশাহ তাকে চিনতে পারেন এবং তাকে বলেন, ওই দিন তুমি উপহার বা অনুদান গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবে যেদিন তোমার বহুরূপে মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। ফলে সে চলে যায়।

একবার হঠাৎ করে বাদশাহকে বিশেষ প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতে সফর করতে হয়। ওই বহুরূপীও ওই এলাকায় এসে দাড়ি রেখে পুরোপুরি বুযুর্গ সেজে আস্তানা গেড়ে বসে এবং অল্প দিনের মধ্যে চতুর্দিকে তার কৃত্রিম বুযুর্গীর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আলমগীরের (রাহঃ) নীতি ছিলো, তিনি যে এলাকায় যেতেন সে এলাকার আমীর-ফকরী, আলিম-বুযুর্গ সকলের সাথে সাক্ষাৎ করতেন; সকলের খোঁজ খবর নিতেন। সেখানে পৌছার পর তিনি প্রথমেই লোকের মুখে ওই বহুরূপী বুযুর্গের সুনাম শুনে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রেরণ করেন। মন্ত্রী তার নিকট যেয়ে তাকে আধ্যাত্মিক বিষযে বিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তার সুন্দর জাবাব দেয়।

আসলে ওই লোকটি মানুষকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এর মধ্যে তাসাউফের ওপর অধ্যয়ন করে এ বিষয়ের অনেক কিছু জেনে নেয়।

ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়ায় মন্ত্রী যেয়ে তার সম্পর্কে বাদশাহর নিকট ভূয়শী প্রশংসা করেন। ফলে বাদশাহও আগ্রহী হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পরস্পরে অনেক কথা হয়। বাদশাহ মনে মনে ভাবলেন, লোকটি আসলেই কামিল-বহু বড় বুযুর্গ। বিদায় নেয়ার পূর্বে বাদশাহ তাকে খুশী হয়ে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। লোকটি তা লাথি মেরে ফেলে দেয় এবং বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলে, আপনি কি নিজের মত আমাকেও দুনিয়াদার, অর্থলোভী মনে করেছেন? এতে লোকটির বুযুর্গীর প্রতি বাদশাহর আস্থা আরও বেড়ে যায়। নির্লোভ আসলেই প্রশংসার বিষয়। এ গুণ লাভ করা কোন সহজ সাধারণ কাজ নয়। নির্লোভ হতে পারা একটি অসাধারণ ব্যাপার।

অতপর বাদশাহ আলমগীর সেনা ছাউনীতে চলে আসলে তাঁর পিছনে পিছনে ঐ লোকটিও এসে উপস্থিত হয় এবং বাদশাহকে বলে, দিন আপনার উপহার! বাদশাহ তাকে মামুলী ধরণের কিছু উপহার দিয়ে বলেন, তখন তো উপহারের পরিমাণ অনেক বেশী এবং মুল্যবানও ছিলো, তা গ্রহণ করেননি কেন? লোকটি বল্লো, তখন তা গ্রহণ করলে আমার অভিনয় অকৃত্রিমতা আপনার নিকট অপ্রকাশিত থাকত। দ্বিতীয়ত ওই সময় আমার ভেশ ছিলো বুযুর্গ লোকের। আর বুযুর্গ লোকেরা কখনও কোন দুনিয়াদার বাদশাহর উপহার গ্রহণ করেন না। [ক্রমশ]

সংকলনঃ আবুল হাসান আজমী

অনুবাদঃ ম, আ, মাহদী

আমরা যাদের উত্তরসূরী

আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রাহঃ)

মুহাম্মদ সালমান

"আরাম আয়েশ মানব জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু। এটা হতে পারে যে, সাপ মানুষের সব চেয়ে বড় দুশমন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন সময় মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে বসে এবং তাকে দংশন করা থেকে বিরত থাকে বা এরকম হতে পারে যে বিষ তার উপর কোন প্রতিক্রিয়া করে নাই এবং মানুষ বিষ পান করার পরও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু কোন কওম এবং গোষ্ঠী আরাম আয়েশ এবং আড়ম্বর প্রিয়তার মধ্যে ডুবে গেলে, কঠোর পরিশ্রম করে এবং সাধারণ জীবন যাপন থেকে দূরে সরে গেলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কোন রকম সম্মানের জীবন দান করেন না। আরাম প্রিয়তা এবং মানব জীবনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। জীবনের জন্য আরাম আয়েশ তালাশ করা, মানুষের জন্য এক চিকিৎসা বিহীন রোগ এবং আরাম আয়েশের উপস্থিতি মানুষের ইজ্জত এবং সম্মানের জন্য মউতের পয়গাম স্বরূপ।" উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত বাক্যগুলি বলে ছিলেন খ্যাতনামা দার্শনিক, আলিম এবং চিন্তাবিদ আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী।

জন্মঃ শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ১৩০৫ হিজরীর ১০ই মুহরাম মুতাবিকে ইংরেজী ১৮৮৭ সারে বিজনৌরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান। হযরত উসমান (রাঃ) পর্যন্ত তাঁর বংশ পরম্পরা মিলিত হবার কারণে তিনি তাঁর নামের শেষে উসমানী শব্দ ব্যবহার করেন। মাওলানা ফযলুর রহমান ঐ সময় বিজনৌর শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনেসপেক্টর ছিলেন। তিনি সে যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা মামলুক আলীর নিকট থেকে তিনি বিশেষ সুবিধা লাভ করেন। হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান এই কলেজের ডিগ্রী প্রাপ্ত ছিলেন। ফারসী ভাষায় তার প্রচুর দখল ছিল এবং এ ভাষায় তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বৃটিশ গর্ভমেন্টের অধীনে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করতেন এবং শেষের দিকে ডেপুটি ইনেসপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চাকুরী জীবন শেষেও দ্বীনি এবং ইলমী কাজে নিজেকে জড়িত রাখেন এবং বিশেষ করে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ)-এর সাথে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সহযোগী হিসেবে কাজ করে ছিলেন। ১২৮৩-১৩২৫ পর্যন্ত দারুল উলুমের উন্নতিকল্পে জীবনকে অকৃফ করে দেন। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী এবং মুফতী আযিযুর রহমান তাঁরই অপর দুই সুযোগ্য পুত্র।

শিক্ষাঃ দেওবন্দে জনাব হাফিয মুহাম্মাদ আযম সাহেবের নিকট ছয় বছর বয়সে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানীর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এর পর ১৩১৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলমে উর্দু ফার্সী পড়া শুরু করেন। ১৩১৮ হিজরীতে তার আরবী পড়া শুরু হয় এবং দারুল উলুমের তৎকালীন খ্যাতনামা উস্তাদগণের নিকট পড়াশুনা করেন। হযরত উসমানী ছিলেন খুবই ধীশক্তি সম্পন্ন। প্রতি ক্লাশেই তিনি প্রথম হতেন এবং শত করা নিরানব্বই নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন। ১৩২৫ হিজরীতে কুরআন হাদীস এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান নিয়ে তিনি দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পাশ করেন। শায়খুল হিন্দ হজযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা গোলাম রসুল সাহেব, হযরত মুফতী আযীযুর রহমান সহেব, হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেব প্রমুখ বিখ্যাত আলিম তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

বিবাহঃ হযতর মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী ছাত্র জীবনেই ১৯০৫ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চিরজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য নিজের আত্মীয় স্বজনদের আওলাদেরকে এবং বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন এবং তাদের খুবই মহব্বত করতেন।

অধ্যাপনাঃ দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে কুরআন হাদীসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর আল্লামা উসমানী তাঁর অর্জিত জ্ঞান-গবেষণাকে আদর্শ আলিম তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য অধ্যাপনার মহান দায়িত্বকে বেছে নেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই খুবই ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অন্যান্য ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে কিতাব বুঝার জন্য ভীড় জমাতো। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। ১৩২৫ হিজরীতে দারুল উলুমে লেখাপড়া শেষ করার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের যোগ্য সাগরিদকে তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়ে তাঁকে ১৩২৬ হিজরীতে দারুল উলুমে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি সিনিয়র অধ্যাপক হিসেব অধ্যাপনা শুরু করেন।

মাদ্রাসা ফতেহচুরীতেঃ হযতর মাওলানা উসমানী দারুল উলুমে অধ্যাপনা

শুরু করার পর দিল্লীর বিখ্যাত মাদ্রাসার জন্য একজন যোগ্য প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে মৌলভী আবদুল আহাদ সাহেব দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম জনাব হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব উসমানীর নিকট আকুল আবেদন জানান। মুহতামিম সাহেব যিনি হযরত উসমানীর বড় ভাই ছিলেন তিনি তাকে এ পদের জন্য যোগ্য মনে করে ফতেহচুরীর মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। ১৩২৮ হিজরী পর্যন্ত তিনি সেখানে হাদীস এবং তফসীরের দরস দেন। এসময় আল্লামা ইব্রাহীম বিয়াভীও ঐ মাদ্রাসার অধ্যাপক হয়ে আসেন। মাওলানা উসমানী বক্তৃতা ও কলমের মাধ্যমে এবং অধ্যাবসায় অল্প সময়ের মধ্যে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পুনরায় দেওবন্দেঃ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর মত সুদক্ষ গবেষক আলিমের প্রয়োজন ছিল এশিয়ার আল আজহার-দারুল উলুম দেওবন্দের। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেই মজলিসে শুরায় মাওলানাকে দারুল উলুম ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে তিনি ১৩২৮ হিজরীর প্রথম দিকে পুনরায় দারুল উলুমে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উপরের দিকের কিতাব পড়াতে শুরু করেন। ১৩৩৮ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ হজ্জে যাওয়ার পর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হযরত শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রধান অধ্যাপক মনোনীত হন। তিনি বুখারী ও তিরমিজী পড়ানো শুরু করেন। তখন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ সাহেব মুসলিম শরীফ পড়াতেন। এভাবে হযরত শায়খুল হিন্দের উপস্থিতিতেই উসমানী সাহেব সাত-আট বছর হাদীসের অধ্যাপনা করে আসছিলেন। তিনি সাধারণত মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফের দরস দিতেন। ঐ সময় হযরত শায়খুল হিন্দের পরে এই দুই ব্যক্তিত্বই হাদীস শাস্ত্রের এসব বিখ্যাত কিতাবের দরস দানের বেশী যোগ্য ছিলেন বলে মনে করা হয়।

আল্লামা উসমানী প্রথম জীবনে দর্শন এবং ইলমে কালাম মোতাবিক ফালসাফা প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকে বেশীঝুকে পড়েন পরে আস্তে আস্তে কুরআন এবং হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেন এবং শেষ জীবনে কুরআন এবং হাদীসের দরস তাদরীস এবং গবেষণায় কাটিয়েদেন।

ডাভেলের জামেয়া ইসলামিয়াঃ আল্লামা উসমানী দারুল উলুম দেওবন্দে খুবই সুনামের সাথে অধ্যাপনায় রত ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় দুর্ভাগ্য ক্রমে মাদ্রাসার কয়েকজন খ্যাতনামা উস্তাদের সাথে মাদ্রসা কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। যার ফলে আল্লাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, মাওলানা ছেরাজ আহমাদ, মাওলানা হিফযুর রহমান, মুফতী আতীকুর রহমান এবং আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম গুজরাটের ডাভেল জামেয়া ইসলামিয়ায় গমন করেন। মাদ্রাসার পূর্ব নাম ছিল তালীমুদ দ্বীন। অল্পসময়ে ডাভেলের ক্ষুদ্র মাদ্রাসাটি একটি উন্নত মানের মাদ্রাসায় পরিণত হয় এবং ঐ এলাকায় শিরক, বেদআত এবং বদদ্বীনী রুসুম রেওয়াজ দূরীভূত হয়। (১৩৪৬ হিজরীতে) এ মাদ্রাসায়ও শাহ কাশ্মীরীই বুখারী এবং তিরমিজি পড়াতেন এবং হযরত উসমানী মুসলিম শরীফ, বয়যাবী এবং তাফসীরের কিতাব পড়াতেন। ১৩৫২ হিজরীতে হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ইন্তেকাল করলে মাওলানা উসমানী শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন এবং বুখারী তিরমিযির দরস দেয়া শুরু করেন। ডাভেলে অবস্থান কালে তিনি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তাবলীগীর দায়িত্ব আদায় করতেন।

পুনরায় দেওবন্দেঃ দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে আল্লামা আরওয়ার শাহ কাশ্মীরী এবং মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী সহ কতিপয় খ্যাতনামা উলামায়ে কেরাম ডাভেল মাদ্রাসার চলে যাবার পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীকে (রহঃ) শায়খুল হাদীস নিযুক্ত করা হয়। আর এটা বাস্তব যে, শাহ সাহেব এবং উসমানী সাহেবের চলে যাওয়ার পর শায়খুল হাদীস পদের জন্য হযরত মাদানীর উত্তম আর কোন ব্যক্তিত্বের আশাকরা মুশকিল ছিল। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের মত ইউনিভারসিটির জন্য আল্লামা উসমানীর মত খ্যাতনামা, সকল বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য আলিমের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এবং এ ব্যাপারটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে অনুভবও করছিলেন। অবশেষে মাদ্রাসার তৎকালীন পৃষ্টপোষক হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী (রহঃ) এবং মুজলিসে শুরার আরো কয়েকজন সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টায় হযরত মাওলানা উসমানী দারুল উলুমের সদর মহতামিম পদ গ্রহণ করতে রাজী হন। মোটকথা ১২৫৪ (১৯৩৯) হিজরীতে তাঁকে সদর মুহতামিম বানানো হয়। ঐ সময় তিনি ডাভেল মাদ্রাসার দায়িত্বেও ছিলেন এবং দারুল উলুমেরও দেখা শোনা করতেন। তিনি এ পদে ১৩৬২ (১৯৪৪) হিজরী পর্যন্ত সমাসীন ছিলেন। দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাঃ তৈয়্যব সাহেবের যুগ দারুল উলুমের সোনালী যুগ। তা সত্ত্বেও আল্লামা উসামনীর মত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁকে দারুল উলমের ছদর মহতামিম বা ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়। হযরত উসমানীর আমলে দারুল উলুমের বহু উন্নতি সাধিত হয়।

দেওবন্দে স্থায়ী ভাবে অবস্থানঃ দারুল উলুম দেওবন্দের ছদর মুহতামিম পদ গ্রহণ করার পর মজলিসে শুরার সদস্য গণের ইচ্ছা ছিল যে, হযরত উসমানী স্থায়ী ভাবে দারুল উলুমে অবস্থান করুক, কিন্তু

যেহেতু তিনি ডাভেল মাদ্রাসারও দায়িত্বে ছিলেন এজন্য বেশীর ভাগ সময় তাঁকে ডাভেলে থাকতে হত। দারুল উলুমের দায়িত্ব গ্রহণ করার ছয় বছর পর তিনি ডাভেল থেকে বিদায় নিয়ে স্থায়ী ভাবে দুরুল উলুমে চলে আসেন।

পুনরায় ডাভেলেঃ দারুল উলুমের ছদরে মুহতামিম হবার পর বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বিরক্তি হয়ে ১৩৬২ হিজরীর সাবান মাসে তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৩৬২ (১৯৪৪) হিরজী ২৪শে রবিউল আউয়াল থেকে ডাভেলের মাদ্রাসায় পুনরায় হযরত উসমানীর দরস শুরু হয়। ১৩৬৩ হিজরীর শাবান মাসে ডাভেল থেকে কোন কাজে দেওবন্দ আসলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক বছর অসুস্থ অবস্থায় দেওবন্দে কাটান।

আল্লামা উসমানীর রাজনৈতিক চিন্তাধারাঃ উপমহাদেশের মুসলমানদের সাথে তুরস্কের খুবই সৎভাব ছিল। এজন্য ১৩৩০ হিঃ মোতাবেক ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় মুসলমানগণ খুবই ক্ষুব্ধ হয় এবং উলামায়ে দেওবন্দ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ), দারুল উলুমের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আল্লামা উসমানী যেহেতু দারুল উলুমের সুযোগ্য ছাত্র এবং পরবর্তী জীবনে খ্যাতনামা অধ্যাপক আলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন এ সূত্রে তিনিও নীরব ভূমিকায় থাকেন নি বরং আস্তে আস্তে ১৩৩১ হিজরীর প্রারম্ভ থেকে তিনি রাজনীতির ময়াদানে পদচারণা শুরু করেন। তুরস্কের হিলালে আহমার বা রেডক্রস সোসাইটি সাহায্যের জন্য তিনি ব্যাপক প্রচেষ্টার পর বেশ কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেন।

হযরত শায়খুল হিন্দের দীর্ঘ চার বছর কারাভোগের পর ১৯২০ সালে ভারতে ফিরে আসার পর থেকে মাওলানা উসমানী সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় উপমহাদেশের রাজনীতির ময়দান খুবই উত্তপ্ত। খিলাফত আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো। ইংরেজ শাসকদের ভীত নড়বরে হয়ে উঠে ছিলো। এ সময় হযরত শায়খুল হিন্দ অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে কুরআন হাদীসের আলোকে একটি ফতোয়া জারী করেছিলেন। আর এ ফতোয়াটি তৈরী করেছিলেন আল্লামা উসমানী। এ ফতোয়াটি আগুনের উপর ঘি ঢেলে দেয়ার কাজ করে।

মাল্টা জেল থেকে ফিরে আসার পর হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান বৃদ্ধ বয়সে মাওলানা উসমানীকে সাথে নিয়ে ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে সফর করেন এবং বক্তৃতা করেন। এ সব জলসায় হযরত উসমানী শায়খুল হিন্দে মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলনসহ মুসলমানদের সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের চক্ষু শূল হয়ে দাড়ায়। এজন্য তখনি একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহারের নেতৃত্বে কাজ করতে হয় এবং এটি আলীগড়ে স্থাপনের সিদ্ধানত নেয়া হয় এবং আলীগড় মুসলিম উইনিভার্সিটির কিছু ছাত্র এ অগ্রণী ও সাহসী ভূমিকা পালন করে। জামিয়া মিল্লিয়া নামে এ ভারসিটিটির উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় হযরত শায়খুল হিন্দকে। অসুস্থ অবস্থায় শায়খুল হিন্দ আলীগড়ে যেয়ে জামেয়া মিল্লিয়া উদ্বোধন করেন বটে তবেতার অসুস্থতার কারণে আল্লামা উসমানী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। জামিয়া মিলিয়াকে পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

আল্লামা উসমানী ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে জড়িত ছিলেন এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি জমিয়তের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। জমিয়তের কোন কোন কাজের ব্যাপারে নীতিগত ভাবে তাঁর বিরোধও ছিলো। বিশেষ করে হিন্দুদের স্বার্থে ইসলামের সব কিছুকে বিলিয়ে দিতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। মোট কথা এ দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতা এবং লেখনীর মাধ্যমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য হিসাবে খুব বড় ধরণের খেদমত আঞ্জাম দেন।

১৯৪৫ সাল থেকে আল্লামা উসমানীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এ সময় মুসলিমলীগ কংগ্রেসের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। কংগ্রেস ছিল বহুজাতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দল। অপরদিকে মুসলিম লীগ ছিল শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক প্লাটফরম। যার লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য পাকিস্তান অর্জন। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে গোটা উপমহাদেশে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। হযরত উসমাণী এ সময় অসুস্থ ছিলেন। যার ফলে প্রায় এক বছর তিনি ডাভেলের মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। সুস্থ হবার পর আল্লামা উসমানী পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষে একটি সংগঠনের ভিত্তি রাখেন। তিনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র বজায় থাকার স্বার্থে সকল মুসলমানকে মুসলিম লীগে যোগদানের আহবান জানান।

আল্লামা উসমানী পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী হযরত উসমানীকে মোবারকবাদজানান।

পাকিস্তান আন্দোলনে আল্লামা উসমানীর অবদানঃ পাকিস্তান আন্দোলনকে কামিয়াব করার জন্য মাওলানা উসমানীর অবদান অবিস্মরণীয়। তার মত খ্যাতনামা আলিমের মুসলিমলীগের প্রতি ঝুকে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের চিন্তাধারাকে অতি সহজে পাকিস্তানের দিকে ফিরানো সহজ হয়। সারা ভারতে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ঝটিকা সফর করেন। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং নবাব জাদা লিয়াকত আলী খান মাওলানা উসমানীকে তাদের পথ প্রদর্শক মনে করতেন। দেশ

(৭ পৃঃ দেখুন)

ব্যাঙ্গ রচনা

অ শু ভ

আবূ ইসমাইল মোঃ দানিয়েল

ঃ ও চাচা মিয়া এটাই কি বিশ্ববিদ্যালয়? না কি অন্য কোথাও নিয়ে এলেন।

ঃ শুদ্ধ বাংলায় মনে হয় এইডারে বিসুবিধালয়ই কয়। তয় আমরা খাস বাংলায় ইন্‌বার্সিটি কই।

ঃ এই সে খানের কথাই বলেছি।

ঃ আরে সক্কাল বেলাতো, বুঝবার পারতাছেন না, এট্টু পরে মিছিল শুরু অইবো তহন বুঝবেন যে, এইডাই ইনবার্সিট। তয় আপনে কোন দলের মিছিল করবেন, বিনপি না আমিলীগ?

ঃ আমি তো ভর্তি হতে এসেছি। এটা মিছিলের জায়গা না। পড়াশুনা হয় এখানে।

ঃ আরে হেডিতো আমিও শুনছি। কিন্তুক আমি তো আইলেই দেহী ভাইজানেরা ঐতিহাসিক জনসভা আর বিশাল মিছিল বহর—আর আপামনিরা বারান্দার মইদ্যে খারাইয়া হেইডি দ্যাহে। ত সারে গো দেহিনা, হেরাই মনে হয় পরালেহা করে।

ঃ আরে ক্লাশতো হয় ভিতরে, সেখানে গেলে দেখবেন।

ঃ ভাই রুটি রুজির ধান্দায় রিক্সা চালাই দেইখা আমাগো কি জানের মায়া নাই। দোয়া ইনুস পড়তে পড়তে এহেন ডুকি আর বাইরাই। আর আপনে কইলেন ভিতরে যাইতে। নতুন আইছেন ভাই, মায়ের পোলা মায়ের কোলে সহি-সালামতে ফিরা যাইতে পারেন এই দোয়াই করি আল্লাহ্‌র কাছে।

ঃ মাঝে মাঝে মারামরি হয় সে জন্য বলছেন?

ঃ মাঝে মইধ্যে কই? কইতে গেলে হারাডা বছরই তো মারামারির বন্ধথাহে। আইজ তিরিশ বছর ঢাকা আইছি। স্বাধীনতার আগেতো ছাত্ররা এইরহম গোলাগুলি করত না। তয় লাঠি হকিস্টিক আছিল হুনছি। হুনেন, আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি। হেইডা অইল গিয়া ঐ যে, ঐডা কি চিনেন?

ঃ ঐ যে দুইজন লোক আর এক মহিলার মূর্তির কথা বলছেন তো? আগে এর ছবি দেখেছিলাম। অবশ্য মূর্তি তো থাকার কথা হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের এলাকায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে মূর্তি কেন কে জানে।

ঃ কতা তো ভাই ঐহানেই। হুনেন, এইডা অইলো গিয়া 'যুদ্ধ-মূর্তি।'

ঃ যুদ্ধ মূর্তি? কেন?

ঃ আরে দ্যাহেন না কান্ধে বন্দুক! দ্যাশ স্বাধীনের পর মূর্তিডা এইহানে ফিট করল। ব্যস, তখন থিকাই ইনবার্সিটে শুরু অইয়া গেল যুদ্ধ।

ঃ সে আবার কেমন কথা!

ঃ বিশ্বাস অইলো না ভাই? বিশ্বাস না অইলে এহেনের বুড়া বুড়া ছাত্রগো জিগাইয়া দ্যাহেন। ঢাকা শহরের বাতাস লাইগাইতো আমার কাঁচা দাড়ি পাকা অইল। যা কইতাছিলাম—যুদ্ধ হেই যে শুরু অইল আরতো থামে না। এই তিন মূর্তির সামনে কত যে লাশ পড়লো হে আর কি কমু। ঐ সর্বনাশা মূর্তি—

ঃ আপনি মূর্তির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাচ্ছেন কিন্তু।

ঃ যা সত্য তাই কইতাছি। খালি এই মূর্তি ক্যা— মসিন হলের মাঠের কোনাদিয়া যেই আদাইন্না মূর্তিডা আছে হেইডার সামনে তো কয়দিন পর পরই একটা কইরা বলি অয়। আর এরশাদরে খ্যাদানের সময় মানষের বানাইন্না দোয়েল পাখিডারে আশ্রয় কইরাই দ্যাশের সেরা মাস্তানেরা ইনবার্সিটি সাফা কইরা ফালাইতে লইছিল।

ঃ আর টিস্‌সির সামনের নতুন মূর্তিডা এক সেরা ডাক্তারের রক্ত খায় নাই কইতে চান? কন আমার কথা ভুল?

ঃ না, আমি ভাবছি—আপনার হাইপোথিসিসে ভিত্তি আছে অবশ্য। জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটিতে আগে গন্ডগোল হতনা। কিছুদিন আগে একটা মূর্তি তৈরী হওয়ার পর সেখানে একটা ছেলে মারা পড়ল। তার মানে আপনার প্রকল্প কোন সূত্রের মর্যাদা পেতে পারে হা-হা-হা।

ঃ আরে ভাই এইডাকি আমার কথা? এইডাতো অইল গিয়া আল্লা রসূলের কথা। ফেরাউনের মূর্তিতো আল্লায় পরমান রাইখাই দিছে। যত দ্যাশ ধ্বংস হইছে বৈজ্ঞানিকরা মাডি খুইরা দ্যাখছে বেশীর ভাগই হ্যারা মূর্তি পূজা করত।

ঃ হ্যা তা আমিও শুনেছি।

ঃ আরে আগের মাইনষেরাতো হাতে বানাইনা মূর্তিরে খুশী করনের লাইগা মানুষ বলি দিত। বিধবাগো পুইরা মারত আরও কত কি। এতে মূর্তি খুশী হইবো কেমনে হেগো তো পরান নাই-আসলে মূর্তি অইলো শয়তানেরই বিভিন্ন সুরৎ। আউলিয়ারা কলেমার দাওয়াত দিয়াই তো আমাগো ঐ শয়তানের খপপর থিকা বাছাইছেন।

ঃ শোনেন, চুপে চুপে কই, এহেনে তো আবার আল্লা রসূলের (সঃ) নাম জোরে লওন বিপদ। আমাগো নবী মোস্তফার (সঃ) ফাতে মক্কার পর সবাই যহন মোসলমান অইল হ্যার পরেও কিল্লাইগা লাত ওজ্জার মূর্তি

ভাঙতে কইলো কেউ তো পূজা করত না তবু কইলো। কারণ, মূর্তির মইধ্যে কোন ভালাই নাই। আর মূর্তির মইধ্যে শয়তান ভর কইরা মাইনষেরে কষ্ট দ্যয়। এই মূর্তির উছিলা কইরা কইরা মানুষ আবার খারাপ অইয়া যাইতে পারে বইলাই ভাঙছে।

আপনি তো ভালই জানেন বোঝেন দেখছি।

ঃগরীবের এলেম আর কতডুন কন। দেইখা দেইখা কোন রহমে প্যাপার ট্যাপার পরতে পারি, আরকি। তয় ওয়াজ নসিহত, বড় বড় প্যাসেঞ্জারগো কথাবার্তা হুইনা কিছু কিছু বুঝে আহে। আইচ্ছা কয় দিন ধইরা বি-দ্যাশের শিক্ষিত শিক্ষিত মাইনষে উচা উচা মূর্তি ভাঙছে হেইডা হুনছেন নি?

ঃ হ্যা, এতো সবাই জানে। আপনার মত করে না হলেও এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি। আসলে কমুনিস্টরা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরোধী একটা ব্যবস্থাকে চালিয়ে নেয়ার জন্য বাম নেতাদের মূর্তি ব্যবহার করেছে যাতে করে নিত্যদিন বড় বড় মূর্তিগুলো দেখে দেখে ওদের মতবাদকেও বড় করে দ্যাখে সবাই।

ঃ দেকছেন অবস্থাডা! এই হানেও শয়তান মূর্তি দিয়া মানুষের ধোকা দিয়া বোকা বানাইয়া রাখছিলো।

ঃ হ্যা তাইতো প্রথম সুযোগেই সে সব দেশের মানুষ মূর্তির উপর আঘাত হেনেছে। কারণ ওগুলো ছিল তাদের উপর চেপে বসা অপশক্তির অন্যতম আশ্রয়। গনমুক্তির পথে বড় বাধা হিসেবেই ওগুলো চিহ্নিত হয়েছে।

ঃ মুক্তির কথা কইলেন! এক মূর্তি ভাইঙা আরেক মূর্তির পূজা শুরু করলেই মানুষ মুক্তি পায়?

ঃ মানে?

ঃ সাগরের হেইপাড়ে যেই দ্যাশে যাওনের লাইগা সবাই পাগল হেই জায়গায় দুনিয়ার সব চাইতে বড় মূর্তিডার বাসা। দুনিয়ার তাবৎ কাফের মোশরেক, খোদা ভোলা মানুষ গুলা হেই মূর্তির তাবেদারী শুরু করছে। হেইডার নাম অইলো স্বাধীনতার বেদী, গণতন্ত্রের দেবী। মশাল আতে লইয়া খারাইয়া রইছে, য্যান সারা দুইন্যাইতে অশান্তির আগুন লাগাইয়া দিতে চায়।

ঃ কি বলছেন এসব। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' আবার কি করল?

ঃ কি করছে মানে? কি করে নাই হেইডা কন। হেই দেবীর সেবাইতেরাইতো স্বাধীনতা গণতন্ত্রের বুলি মুখে লইয়া নানা অজুহাতে দ্যাশে দ্যাশে হামলা করতাছে। সারা দুইন্যাইডা ভাইজা খাওনের ভাও কারতাছে। সব দ্যাশগুলোরে টাহার জোরে আর বন্দুকের জোরে বশে আনতে চায়। হ্যারা চায় সারা দুইন্যাইডা য্যান হেই দেবীর কাছে মাথা নোয়াইয়া থাহে। হ্যারা স্বাধীনতার বরকন্দাজ সাজছে। কুয়েত স্বাধীন কইরা নিজেরাই ঘাটি গাইরা বইছে। হ্যারা গণতন্ত্রের বরকন্দজ হইছে। আলজিরিয়ার জনগন হুজুর-মাওলানাগো ভোট দিছে দেইখা হ্যাগো দালালেরা মাশাল্য দিছে। হ্যারা শান্তির কইতর সাজছে, ইহুদিগো মুসলমানগো বিরুদ্ধে লেলাইয়া সর্বনাশা যুদ্ধ বাজাইছে। কিন্তুক আরনা এইবার খেইল খতম অইব। সারা দুইন্যাইর মুসলমানরা জাগছে। কইতাছে দুনিয়ার মজলুম এক হও। হ্যার পর মজলুম মাইনষেরা সব এক অইয়া আল্লাহ্‌র গোলামীর রশি লাগাইয়া এমুন টান দিব ঐ দেবীরে, এক্কেরে কাইত। আরে এ এ এ বলরে মুমিন, হেইও--আরও জোরে হেইও-- হ্যাচকা টানে, হেইও--শান্তি আনে, হেইও-- আল্লার নামে, হেইও--- ইনশাআল্লাহ, হেইও--- পাইরা যাইব, হেইও--আরও জোরে, হেইও--।

বাংলাভাষার প্রকৃত ইতিহাস

(২০ পৃঃ পর)

তন্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ বলেও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পানি উথিত হয়েছিল। কিন্তু এ তন্নুর শব্দটির প্রথমে কুরআন মজিদে আলিফ লাম যোগ করা হয়েছে-যার অর্থ বিশেষ কোন তন্দুর। এ সম্পর্কে ওলামাগণের ব্যাখ্যা হল, হয়ত উক্ত তন্দুরটি সম্পর্কে হযরত নূহই (আঃ) কেবল অবগত ছিলেন। হযরত হাসান বসরী বর্ণনা করেন, উক্ত তন্দুরটি পাথরের নির্মিত ছিল এবং হযরত হাওয়া (আঃ) উক্ত তন্দুরে রুটি ইত্যাদি পাক করতেন। পরে ঐটি নূহ (আঃ)-এর হস্তগত হয় এবং তাঁকে বলা হয় যে, যখন তন্দুর থেকে পানি উঠতে দেখবে তখন তুমি সাথীদের নিয়ে কিস্তিতে আরোহন করবে। (লুবাবুত তাবীল-৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৯)

হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ নয়ীম মুরাদাবাদী সাহেবও স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত তন্দুরটি ছিল মূলত হযরত আদম (আঃ) এর। তন্দুর শব্দটি সম্পর্কে বহু বর্ণনা একত্রিত করে আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেন, 'তন্নুর হিন্দুস্থানের একটি জায়গার নাম।' (ফতহুল কাবীর ৩য় খন্ড পৃঃ ৪৭৪) মূলতঃ হিন্দুস্থানের মোল্লাপুর জেলার সমুদ্র উপকূলে তন্দুর অঞ্চল অবস্থিত। এটা হল হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত যা আরব সাগরের কারণে আরব থেকে পৃথক হয়ে আছে।

সুতরাং একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, উক্ত স্থান থেকেই নূহ (আঃ)-এর বন্যা শুরু হয়। এর ফলে অন্যান্য কথারও উত্তর মিলে যায়। অর্থাৎ এসব কথা থেকে অনুমিত হয় যে, বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আঃ) এই ভারত বর্ষেই বসবাস করতেন। (আগার আব ভী না আগেতো-পৃঃ ৫১)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিতহয় যে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষই ছিল মানব জাতির আদি নিবাস। [অসমাপ্ত]

সাচ্চা উম্মত

আবদুল হালীম খাঁ

এগারো কোটি মুসলমানের এই বাংলাদেশ,
এখানে গ্রামে মহল্লাতে আছে ইসলামী পরিবেশ।
দিনে পাঁচবার ধ্বনিত হয় মসজিদে আযান,
সভা–মাহফিলে প্রচারিত হয় দ্বীনের আহবান।
শাহজালাল, তীতুমীর, খানজাহান আলী খান,
মখদুমশাহ, আমানত উল্লাহ আরো কত মহান।
লাখো আউলিয়া পীর, দরবেশ এখানে শুয়ে আছে,
তাঁদের স্মৃতি কার্যকলাপ জীবন্ত আমাদের কাছে।

শহীদের খুনে এই বাংলার প্রতি ধূলি কণা পাক,
আজো এখানে বুলন্দ সেই তওহীদের মহাডাক।
আজো এখানে দিকে দিকে জাগে সাচ্চা মুজাহিদ,
শহীদী খুনে গোছল করে আজো তাঁরা করে ঈদ।
আলী খালিদের বংশধরেরা এখানে আজো জাগে,
তওহীদের ডাকে আজো তাঁরা চলে আগে আগে।
ঘরে ঘরে ময়দানে ওরা দ্বীনের কথা বলে,
জাহিলিয়াতের আঁধারে ওরা অগ্নিসম জ্বলে।

পাথর কেটে পাহাড় ভেঙে ওরা তৈরী করে পথ,
নবী মুহাম্মদের (সঃ) ওরাই যে সাচ্চা উম্মত।

জাতিসংঘ তুমি কার?

শেখ মোঃ সাইফুল ইসলাম

জাতিসংঘ তুমিম কার, মুখ খুলে বল একবার,
তোমাকে নিয়ে মনে শুধু মোর জাগে সন্দেহ বারবার।
সকল জাতির সংঘ তুমি এটাই আমরা জানি,
তুমি যে দেখছি ইয়াহুদী সংঘ কেমন কথা ছি!
তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব আছে সকল বিশ্ববাসীর
দায়িত্ব ছেড়ে হয়েছ এখন উপযুক্ত তব ফাঁসির।
সারা দুনিয়ায় হাহাকার আর গগণ ফাটা ফরিয়াদ,
পেতে রেখেছে সব পাপিষ্ঠ গুলো মানুষ মারার ফাঁদ।
মরছে শুধু মানুষগুলো মুসলমানীর অপরাধে
চড়ে বসেছে সব হোতারা আজ নাচিছে তোমার কাঁধে।
তোমারে করেছে নির্বাক আর কাজ করিতেছে শুধু ওরা
মিষ্টি মধুর কথাগুলি ওদের মুখেতে রয়েছে ভরা।
হাত কেন তুমি গুটিয়ে রেখেছো কর্তব্য কি আজ নাই
কর্তব্য পালনে কভু হবে না পিছপা,ওয়াদা তো ছিল তাই।
চাহিয়া আছি কবে আসিবে তুমি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে
আসিয়া দেখিবে দুখীদের দেশে দাউ দাউ করে জ্বলছে।
তোমার হাতে ক্ষমতা অনেক, ছিলো হস্ত পুরু
তবে কেন বসে আছ হাত পা গুটিয়ে ভীরু?

শপথ

মোঃ আলমগীর কবির

ভয় পেয়োনা লক্ষি সোনা কিশোর তরুণ ভাই
গোলা বারুদ বোমা বাজী নতুন কিছু নয়।
দালাল রুপী বাতিল পন্থী নর খাদকের দল
চুষছে তারা রক্ত মোদের ধ্বংস করছে বল।
জুলুম তন্ত্র শোষন তন্ত্র মরণ তন্ত্রও হয়
হেড়ে গলায় একে আবার গণতন্ত্র কয়।
ফ্যাসিবাদ আর পুজিবাদ বাদ পড়েছে আজ
এসব কিছুও বাদ পড়িবে আর কটা দিন যাক।
রক্ত হাতে শপথ নিচ্ছি মোদের কিসের ভয়
খোদার দেয়া জীবন যদি খোদায় নিয়ে যায়।
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী আল কুরানে কয়
শাহাদাতের আশায় গাজী হলে তবেই হবে জয়।

কিডনী ও লিভার বাঁচান

বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, ১৯৯০ সনে পি, জি, হাসপাতালের এক জরীপে প্রকাশ বাংলাদেশের প্রায় ১ (এক) কোটি লোক কম বেশী লিভার ও কিডনী সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন। যাহা দেশের জন্য এক বিরাট হুমকি স্বরূপ। ভবিষ্যতে এই সমস্যা মহামারী আকারে রূপ নিতে পারে। পরিণতিতে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বহু লোকেরা কালে জীবন ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট শিশুরাও এ সমস্যা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, এলার্জি ও চর্মরোগের চাপা দেওয়া চিকিৎসা ক্রোনিক আমাশা ও গ্যাষ্ট্রিকের কু–চিকিৎসা, জন্ডিসের নামে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, যৌন ব্যাধির ব্যর্থ চিকিৎসা, এম আর এর নামে আনাড়ী দাই দিয়ে জরায়ু ও কিডনীর মারাত্মক ক্ষতিকরা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা।

যাদের তলপেটে ও কোমরে কিডনী বরাবর চিন চিন করে বেদনা, প্রসাবের ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, মাঝে মাঝে প্রসাবের রং পরিবর্তন হওয়া ও জ্বালা করা, মূত্রনালীতে কামড় দেয়া, দিন দিন যৌনশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ লক্ষণ থাকলে তাদের সময় থাকতে হুশিয়ার হতে হবে।

এছাড়াও যাদের বার বার জন্ডিস হয়, মুখে দাগ পরে, চক্ষুর পার্শ্বে কালো দাগ ও মুখে ব্রণ, অল্প বয়সে চোয়াল ভেঙ্গে যায়, পায়খানার সাথে আটাযুক্ত Mucus ক্ষরণ এবং দিন দিন স্মৃতিশক্তি কমে যায় বা কাজে ভুল হয় তাদের অবশ্য লিভারের কোন না কোন সমস্যা আছে। প্রস্রাব পরীক্ষায় Albumin Trace, Puscells Epithelial cell বেড়ে গেলে কিডনীর সমস্যা থাকা স্বাভাবিক।

লিভারের HBsAg পজেটিভ বা, হেপাটিক বি–ভাইরাস লিভার সিরোসিস, জন্ডিস, কিডনী ষ্টোন, নেফ্রাইটিস ইনফেকশন এনলার্জমেন্ট, জরায়ুর আলসার, প্রতি মাসে একাধিকবার স্রাব, জরায়ুর প্রলাপস এবং মাসিকের সময় পেটে বেদনা ইত্যাদি সমস্যা হতে আরোগ্য বা প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করে আমাদের Case Record Form সংগ্রহ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আপনার লিভার ও কিডনী বাঁচাতে চেষ্টা করুন।

আল্লাহ্ হাফেজ

ধন্যবাদান্তে

প্রফেসর ডাঃ এন, ইউ, আহমাদ
কিডনী, লিভার, ও চর্ম্য রোগে বিশেষ অভিজ্ঞ।

হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিক
২৫, সামসুজ্জোহা মার্কেট (২য় তলঅ)
বাংলামটর, ঢাকা।
সময়ঃ সকাল ৯টা–১টা বিকাল ৪টা–৮টা (শুক্রবার সকালে বন্ধ)

প্রশ্নোত্তর

✪ মুহাম্মাত ইয়াসমিন (মিনি)
দশম শ্রেণী, শাহবাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
যশোর

প্রশ্নঃ *যে মহিলা বেপর্দায় বাইরে খোলামেলাভাবে চলা ফেরা করে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাকে কি বলা হয়?*

উত্তরঃ তাকে দায়ূস বলা হয়। হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দায়ুস কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার পাবে না।"

✪ মোঃ আতিক উল্লাহ মুফলিকার
দাগন ভূঞা,
ফেনী।

প্রশ্নঃ *জাগো মুজাহিদ পড়ে মুরতাদ, মুরতাদের শাস্তি ও পরকালে তার করুণ পরিণামের কথা জানতে পারলাম। এখন প্রশ্ন হলো, মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত থাকা শর্ত কি? যে কেউ এই হুকুম কার্যকর করার অধিকার রাখে কি?*

উত্তরঃ পৃথিবীর কোন বিধানে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া বৈধ বলে না। আইন বাস্তবায়ন করবে সরকার বা আদালত। অনুরূপ ইসলমী আইন বা বিচার পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। যদি দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না থাকে তবে প্রতিটি মুমিনের কাজ হবে এর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া যেমন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত পূর্ণরূপে ইসলামের অনুসরণ করা যায় না।

যদি আপনি অনৈসলামিক রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অগ্রাহ্য করে ইসলামী কোন বিধান কার্যকর করেন তাহলে আপনি সে দেশের আইনে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে দণ্ডিত হবেন। ইসলামী শরীয়াতে হত্যাযোগ্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে আপনি যদি হত্যা করেন তবে প্রচলিত আইনে আপনি মানব হত্যার অপরাধে দণ্ডিতহবেন। দ্বিতীয়তঃ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় দেশের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। তাই কোন অবস্থায় বা কোন ব্যাপারে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নাই। তবে যারা আল্লাহ্‌র সেনা এবং যারা জীবনের চেয়ে শাহাদাতকে মহামূল্যবান মনে করে তাদের কথা আলাদা।

✪ জুলফিকার,
মাদ্রাসায়ে দারুল উলুম,
মোসলমানপাড়া রোড,
খুলনা।

প্রশ্নঃ *হিন্দু জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।*

উত্তরঃ হিন্দুদের ধর্মের নাম 'সনাতন' অর্থাৎ পুরাতন। তবে কত শতাব্দির পুরাতন তার সঠিক ইতিহাস অজানা। একথা সত্য যে, এরা এক সময় তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলো। কে জানে যুগের পরিবর্তন ও বিকৃতির অন্ধকার থেকে সে সত্য আর কোন দিন সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটন করা যাবে কিনা। একথাও সত্য যে, হিন্দুদের সবচেয়ে প্রাচীন দেবতার নাম 'মনু'। গবেষণার মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, এই 'মনু' হলেন 'নূহ (আঃ)। অর্থাৎ এরা নূহ (আঃ)-এর উম্মত। নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী কোন নবী কে যে এরা স্বীকার করে না সে কথা হিনাদুধর্ম বিশেষজ্ঞ শাম্‌স নবীদ ওসছমানী সাহেব তাঁর গ্রন্থে দলীল সহ অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন। এরদ্বারা বুঝা যায় নূহ (আঃ) হলেন এদের নবী। তাঁর ইন্তেকালের পর এই পৌত্তলিকদের উৎপত্তি। যেমন খৃষ্ট ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে।

✪ ডাঃ আনিসুর রহমান,
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
রাজশাহী।

প্রশ্নঃ *কোন একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক নিবন্ধে স্বপ্নের রামরাজ্যের রামবাদী জনৈক বাবু লিখেছেন, "আফগান জনসাধারণ ইসলামের কঠোর অনুসারী। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধবাজ জাতি। বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধের সুযোগ না পেলে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ বিগ্রত করে।"*

আফগানিস্তানের বর্তমান অন্তসংঘাতে আমরা মর্মাহত এবং একথাই কি তাহলে সত্য যে, আফগানিরা যুদ্ধবাজ জাতি, বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধের সুযোগ না পেলে নিজেদের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ করে?

উত্তরঃ "যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা"। প্রবাদটি মনে রাখুন। এরা একসময় বলেছিলো, সোভিয়েতের মুকাবিলায় এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হাতির পায়ের নিচে পিষে যাওয়া পিপিলিকার মত। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা এবং আফগান মুজাহিদদের অসম বিজয় ওদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। এখানেই ওদের যত আপত্তি আশংকা। ওদের হৃদয়ে কাঁপন ধরেছে, ওদের হতাশা চরমে উঠেছে, আফগানের পর এখন যে ওদের ঘরে অপারেশনের পালা-তাই এই সময়ের বিজয়ী কালজয়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদদেরকে অন্য লোকের চোখে কিভাবে ছোট করা যায়-এ কাজে আজ সব বাতিল এক জোট বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে।

তবে এতে ফল হবে না। যেমন ক্ষতিছাড়া কোন লাভ হয়নি সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। তাদের সবষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র মদদে। এই রামবাদীদের দশাও তাই হবে। আল্লাহ্‌র কৌশল ও মারের সাথে কারও কৌশলের তুলনা চলে?

আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আর প্রচার মাধ্যমের সংবাদের সাথে খুব কম সম্পর্ক আছে বলে মনে করি। এরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে তালকে তিল করতে পারে এক মুহূর্তে। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ভালো–আশাতিত ভালো। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এর চেয়ে ভালেঅ পরিস্থিতি আশা করা ঠিক কি?

আপনি লক্ষ্য করুন, সে বলেছে, "আফগান জনসাধারণ ইসলামের তার এ কথাই প্রমান করে, আফগানিস্তানে যা হচ্ছে সব ইসলামের অনুকুলে–পক্ষে হচ্ছে। তাতো এদের কাছে বিষের মত ঠেকানোরই কথা। এ সব মোটেই বিচিত্র নয়, নতুন নয়। সব যুগের আবূহাজেলরা একই চরিত্রের হয়ে থাকে। এদের মডেলে কখনও পরিবর্তন দেখা যায় নি। আল্লাহ্ যাদের হৃদয়ে মুসলিম শত্রুতার মহর মেরে দিয়েছেন তাদের দ্বারা এছাড়া কি আশা করতে পারেন? চামচিকার শত্রুতায় সূর্যের কোন ক্ষতি হয় না। প্রতিদিন সূর্য উঠবে, আর ওরা চোখ বুজে কলা পাতার নিচে লুকিয়ে থাকবে। কি হয় তাতে সূর্যের? আল্লাহ্ তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। ওদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়েছে এবং হবেই। যে সত্য দ্বীনের পক্ষে থাকবে সেহলো আসলবিজয়ী।

✪ মোঃ সেলিম বাহার
কালাউক উচ্চ বিদ্যালয়,
লাখাই,
হবিগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস হওয়ার কারণ কি?*

উত্তরঃ ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুপস্থিতি এর মুল ও অন্যতম কারণ বলে মনে করি।

✪ নাসির টেইলার্স
প্রোঃ মোঃ হাসান আলী
খাদুরা বাজার,
যশোর।

প্রশ্নঃ *কোন নিধর্মীকে দান করলে এর প্রতিফল স্বরূপ কোন নেকী পাওয়া যাবে কি?*

উত্তরঃ দান আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হলে বিফলে যাবে না—অবশ্যই নেকী পাওয়া যাবে।

✪ মোঃ সামসুদ্দীন,
কবির জেনারেল স্টোর,
৩৭৫, বি–খিলগাঁও, তালতলা,
ঢাকা–১২১৯।

প্রশ্নঃ *(ক) প্রাইজ বণ্ডের পুরস্কার গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি?*

(খ) ভরণ–পোষণে অক্ষম ব্যক্তির জন্য অধিক সন্তান নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয কি?

উত্তরঃ (ক) প্রচলিত প্রাইজ বণ্ডের পুরস্কার গ্রহণ করা জায়িয নয়। কেননা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় এটা জুয়ার সামিল। যে কারণে জুয়া অবৈধ ঠিক সে কারণে এটাও অবৈধ। হাজার হাজার লোকের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে মাত্র কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। আপনি আপনার ভাগ্যের পরাজয় মেনে নিলেও কিন্তু ইসলামী আইন আপনাকে ঠকানোর পক্ষে নয়। এটাযে মস্তবড় একটা ঠকবাজি তা স্পষ্ট বিষয়। মানুষের বিবেক যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সত্যাসত্যের তারতম্য করার যোগ্যতা লোভ পায়। আমরা এই ব্যাধির শিকার কি?

(খ) পবিত্র কুরআনের সূরা আন–আমের ১৫১ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না দারিদ্রের কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও (অনাগত শিশুরও) আমিই (রিযিক দান) করব।"

অতএব বুঝা গেলো কোন অবস্থাতেই ভরণ–পোষণের অপারগতার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়িয নয়।

আজও পৃথিবীতে মুসলমানরা সংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি, প্রথম নয়। তাই বিভিন্ন কারণে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয় বরং মুসলমানদের জন্ম বিস্ফোরণ ঘটানো প্রয়োজন।

এই পদ্ধতিটা কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর জ্ঞান প্রসূত তো নয়ই বরং মুসলিম বিধন ও মূসা (আঃ) এর জন্ম নিরোধের লক্ষে এই পদ্ধতি প্রথম গ্রহণ করেছিলো ফেরাউন। তাই বুঝে হোক না বুঝে হোক কোন অবস্থায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। পাশ্চাত্য ও পূর্ব প্রাচ্যের দিকে তাকতান। এর ফলে সেসব দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী হারাম পন্থায় জন্মগ্রণ করছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের দেশেও পূর্বের তুলনায় জেনা–ব্যাভিচার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা যে কোন জাতির ধ্বংসের জন্য একটি মৌলিক বিষয়। আমরা যেহেতু রিযিকের মালিক নই সেহেতু এইসব ঘৃণ্য পদ্ধতি ব্যবহার করে একদিকে যেমন আমরা আল্লাহ্‌র 'রায্‌যাকিয়াতের' সাথে চ্যালেঞ্জ করছি অন্যদিকে ধ্বংস করছি জাতির চরিত্র। জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য অবৈধ সন্তান। বাড়ছে ব্যাভিচার। একটা জাতিকে ধ্বংস ও দেওলিয়া করে দেয়ার জন্য এই একটি

পদ্ধতিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন।

✪ মোঃ ইলিয়াস,
মরকটা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা,
মরকটবাজার।

প্রশ্নঃ *দুইটি লাশের জানাযা একত্রে একই ইমামের পিছনে আদায় করা জায়েয আছে কি?*

উত্তরঃ হ্যাঁ, জায়িয আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বদরে শাহাদাত বরণকারী একাধিক সাহাবীর জানাযা একত্রে আদায় করেছেন।

✪ মোঃ তৈয়্যব আল হোছাইনী,
দেওভোগ মাদ্রসা,
নারায়নগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *বাবরী মসজিদটিকে উগ্রবাদী হিন্দুরা যেভাবে ভেঙ্গে ফেল্লো এর প্রতিশোধ হিসাবে ওদের মন্দিরগুলো ভেংগে মসজিদ বানিয়ে নামায পড়ার অধিকার আছে?*

উত্তরঃ মসজিদটি কোন মন্দিরে এসে ভাংগেনি। তাই আপনার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্র মন্দি নয়। বরং যারা ভেঙ্গেছে আমাদের বোঝা পড়া তাদের সাথে, সেই দেশের সরকারের সাথে। মন্দির ভেংগে মসজিদ গড়ার অধিকার কারও নেই। ইসলামে সধর্মের লোকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্দির ভেঙ্গে কাপুরুষের মত প্রতিশোধ গ্রহণ করা মুসলিম ঐতিহ্য বেরোধী। আমরা বাতিলের সাথে বুঝব খোলা ময়দানে। মুখোমুখি খাপখোলা তরবারী নিয়ে। আমাদেরকে আমাদের ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়।

✪ এ, আর, মঈন উদ্দিন খাজা,
৫১১, গোলাপবাগ,
শিবগঞ্জ, সিলেট।

প্রশ্নঃ *বাবরী মসজিদ নির্মাতা বাদশাহ বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতেচাই।*

উত্তরঃ বিশ্ব বিখ্যাত দিল্লীর মোঘল সম্রাট জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে বাবর ছিলেন চেঙ্গীস খানের এবং পিতার দিক থেকে তৈমুর লংয়ের উত্তরসূরী। বাবরের বাল্যকাল খুব একটা সুখপ্রদ ছিলো না। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে তিনি কাবুল দখল করে সেখানের আমির হন। ক্রমান্বয়ে তার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এই সময় দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল আফগান লোদী বংশের দুর্বল সুলতান ইব্রাহিম লোদী। তার দুর্বলতার সুযোগে মেবারের রানা সংঘ ও বিভিন্ন আফগান আমীরেরা দিল্লীর সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করে। ইব্রাহিম লোদির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পাঞ্জাবের আমীর দৌলতখান লোদী এবং মেবরের রানা সংঘ ইব্রাহিম লোদীকে হটানোর জন্য কাবুলের আমীর বাবরকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। বাবর তাদের আমন্ত্রণক্রমে বারোহাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে ১৫২৬ খৃঃ পানিপথ নামক স্থানে হাজির হন এবং উন্নত যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করে বিশাল আফগান বাহিনীকে পরাস্ত করে দিল্লী অধিকার করেন। দিল্লী অধিকারের পর দূরদর্শী বাবরের চোখে রানা সংঘের ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যত মুসলিম স্বার্থের চরম অমানিশা লক্ষ্য করে তিনি কালবিলম্ব না করে একমাত্র আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে পরের বছর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে খানুয়ার প্রান্তরে বিশাল ও যুদ্ধবাজ রাজপুত বাহিনীর মুখোমুখী হন। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে পরাজিত আফগান সুলতানের ভাই মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক আফগান আমিরও বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বাবরের উন্নত সমরকৌশলের মুখে এই মিলিত বাহিনী চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ভারতবর্ষে রাম রাজত্ব কায়েমের আকাঙ্খা। বাবরের অন্যতম সেনাপতি মীর বাকী বাবরের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফয়েজাবাদে নির্মাণ করেন বাবরী মসজিদ। বারব তৎকালিন হিন্দুদের ভারতে রাম রাজত্ব কায়েমের পথে বাধা দিয়েছিলেন বলে আধুনিক হিন্দুরা প্রতিহিংসায় সেই মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলেছে।

বারব শুধু একজন সমরনায়কই ছিলেন না, তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সর্বোপরী একজন সাচ্চা মুসলমান ছিলেন। 'তুজুকে বাবরী', ও 'বারব নামা' তাঁর লেখা আত্মজীবনী মুলক গ্রন্থ হলেও পণ্ডিতগণের নিকট গ্রন্থ দু'খানি তুলনাহীন ইতিহাস ও উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ বলে সমাদৃত। তিনি ফারসীর ন্যায় তুর্কী ও আরবী ভাষায়ও অনর্গল লিখতে ও কথা বলতে পারতেন। 'বাবরী লিপি' নামে তিনি নিজস্ব একটি লিপি পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই পদ্ধতিতে সমগ্র কুরআন শরীফ লিখে তার এক খণ্ড মক্কা শরীফে প্রেরণ করেছিলে। বারব যে একজন ঈমানদার ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী মুসলমান ছিলেন তা' তাঁর পুত্রের জীবনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনায় বুঝা যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ইন্তিকাল করেন। প্রথমে তাঁকে যমুনার তীরে আরামবাগে দাফন করা হলেও পরবর্তীতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাবুলের অদূরে দিলকুশবাগে দাফনকরা হয়। ক্ষুদ্র এক ভূ-খণ্ডের আমীরের পুত্র বাবর মৃত্যুকালে কাবুল থেকে বাংলা পর্যন্ত বিশাল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

✪ মোঃ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ যশোরী,
জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,
জামাত, শারহে জামী,
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ *আফগান রণাঙ্গণে বাংলাদেশের যশোর জেলার কেউ শহীদ হয়েছেন কিনা? হলে কে বা কতজন শহীদ হয়েছেন? তারা কিভাবে*

এবং কোথায় শহীদ হয়েছেন বিস্তরিত জানতে চাই।

উত্তরঃ আফগান রণাঙ্গণে বাংলাদেশের যশোর জেলার তিনজন মুজাহিদ শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশ্বখ্যাত মুজাহিদ কমাণ্ডার মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী (রাঃ)। অন্যজন হলেন তারই ঘনিষ্ট সাথী মাওলানা নূরুল করিম (রাঃ)। উক্ত মুজাহিদ দুজন উভয়েই একত্রে ১৯৮৯ সালের ১০ই মে খোস্ত রণাঙ্গণে শত্রু শিবিরে ঢোকার পথে মাঈন তুলতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ঐ দিনই শাহাদাৎ লাভ করেন। এছাড়া আফগান জিহাদে বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রথম শাহাদাত বরণকারী হাফেজ কামরুজ্জামান (রাহঃ)-এর জন্মও যশোহরে। ১৯৮৫ সালের ২৫ জুন গজনী সেক্টরে শেরানা যুদ্ধে গুলির আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে শেরানায় দাফন করা হয়েছে।

✪ মোঃ আসফাক হোসাই,
গ্রাম ও পোঃ বারোকোট, সিলেট।

প্রশ্নঃ *সার্বীয় ও বসনিয়দের মধ্যে কখন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধের কারণ কি এবং যুদ্ধ বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে জানতে চাই।*

উত্তরঃ বসনীয় মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে সার্বীয় মিলিসিয়ারা প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে যে একতরফা যুদ্ধাভিযান চালিয়ে আসছে তা' গেল ১৯৯২ সালের প্রথমার্ধে শুরু হয়। বর্তমান বসনিয়া পূর্বে কমুনিষ্ট শাসিত ৬টি প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেল যুগোশ্লাভিয়ার অর্ন্তভুক্ত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক পূর্বক ইউরোপের পরিবর্তনের হাওয়ায় যুগোশ্লাভিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি স্বাধীনতার ঘোষণা করলে বসনিয়ারাও গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু অবশিষ্ট যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব নেতৃবৃন্দ ইউরোপের বুকে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে চাচ্ছে না। পশ্চিমা বিশ্বও সার্বদের এই ক্রোধে ইন্ধন যোগায়। ফলে শুরু হয় মুসলিম নিধন। উল্লেখ্য, সার্বরা অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা মেনে নিলেও বসনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। বর্তমানে জাতিসংঘের অস্ত্র ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে নিরস্ত্র বসনিয় মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখিন। পশ্চিমা দেশগুলি, জাতিসংঘ এবং ওআইসিও তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। মোটকথা, যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর বুক থেকে বসনিয়াদের চিহ্ন মুছে যাওয়ার পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

✪ মোঃ কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী,
সাধারণ সম্পাদক,
জালালাবাদ মটর ড্রাইভিং টেনিং স্কুল,
শাখা অফিস-৩
শাহী ঈদগাহ, সিলেট।

প্রশ্নঃ *কমাণ্ডার আঃ রহমান ফারুকী কোথায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি শহীদ হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বে মুজাহিদের সাথীদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা' বিস্তারিত জানতে চাই।*

উত্তরঃ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী ১৯৮৮ সালে এক মাসের ছুটিতে প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে এলে পশ্চিম বঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা মজিদা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি সেখানে মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থান করে কর্তব্যের ডাকে রণাঙ্গণে চলে যান।

আপনার উল্লেখিত শহীদ হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বের ভাষণের কথা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বাক্ষণে সাথী মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে যে অছিয়ত করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান বিষয় হলোঃ

(১) জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও হরকাতুল জেহাদ আল-ইসলামীর জিহাদের এই পবিত্র মিশনকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

(২) আমার একান্ত বাসনা ছিল ফিলিস্তিন, বোখারা, সমরকন্দ, তাসখন্দ, বার্মা নিজে জিহাদ করে স্বাধীন করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করব, এখন এ দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যাস্ত করছি।

(৩) আমার বাড়ীর সবাইকে বলে দিবে, তারা যেন আমার শাহাদাতের ওপর কোন রূপ কান্নাকাটি না করে।

(৪) আমাকে পবিত্র আফগান রণাঙ্গণেই দাফন করবে।

✪ আবূ দাউদ মোঃ জাকারিয়া,
শ্রীমংগল, মৌলভী বাজার, সিলেট।

প্রশ্নঃ *আফগান জিহাদে কয়টি দেশের মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করেন। মুজাহিদগণ কয়টি দলে জিহাদ পরিচালনা করেন এবং আফগানিস্তানে কত সাল থেকে জিহাদ শুরু হয়।*

উত্তরঃ পাকিস্তান, ইরান, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ ও আরব জাহানসহ কম বেশী প্রতিটি মুসলিম দেশের মুজাহিদ এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদ জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

মুলত আফগানিস্তানের জিহাদ পরিচালিত হয় পাকিস্তানকে ভিত্তি করে। পাকিস্তান ভিত্তিক দলগুলো হলোঃ (১) জমিয়াতে ইসলামী আফগানিস্তান, (২) হেজবে ইসলামী আফগানিস্তান, (৩) হেজবে ইসলামী (ইউনুস খালেস) (৪) ইত্তেহাদে ইসলামী, (৫) হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী, (৬) কওমী মাহাযে মিল্লী ও (৭) জিবহে নাজাতে মিল্লী।

ইরান ভিত্তিক ছিলো বেশ কয়েকটি দল। তার মধ্যে হরকতে ইসলামী নসর ও ফেদাঈন-ই উল্লেখযোগ্য।

আর আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী পাকিস্তানীদের ছিলো দু'টি সক্রিয় দলঃ হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী এবং হরকাতুল মুজাহিদীন। বাংলাদেশীরাও হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর পতাকাতলে সুসংগঠিত ভাবে জিহাদ করে।

সোভিয়েত সৈন্যের মুকাবিলায় সর্বাত্মক জিহাদ শুরু হয় ১৯৭৯ সালের২৭শেডিসেম্বরে।

পরিচালকের চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম,

প্রিয় নবীন বন্ধুরা!

সালাম ও শুভেচ্ছা নিবে। তোমরা যারা আলিয়া মাদ্রাসা বা স্কুলে পড়ো তাদের শিক্ষা বছর শুরু হলো। যারা কওমী মাদ্রাসায় পড়ো তাদের শিক্ষা বছর শেষের দিকে। এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার কারণে বহু গুরুত্বপুর্ণ বিষয়েও আমরা একমত হতে পারছি না। বিষয়টা তোমরা উপলব্ধি কর কি? জাতীয় অনৈক্য আমাদের ঐতিহ্য হয়ে দাড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্নতা। যদি প্রচলিত সব শিক্ষা ব্যবস্থা ভেংগে নতুন করে একটি কাঠামোর ওপর দাড় করান সম্ভব হত তাহলেই আসতে পারে কাংখিত জাতীয় ঐক্য। পারব কি আমরা এই অভিযানে সফল হতে? এর জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। চিরদিন তোমরা মুজাহিদদের মত শির উচু করে বেঁচে থাক।

মাআস্‌সালাম

পরিচালক ভাইয়া

বলতে পারো?

১। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)–কে আবূ হুরাইরা বলা হয়। তাঁর আসল নাম কি?

২। মদীনা শরীফের পুর্বের নাম কি ছিলো?

৩। ক্রুসেড বিজয়ী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী কত সনে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন?

৪। কত সনে কে প্রথম বসনিয়ায় ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন?

৫। ইমাম বোখারী (রাহঃ)–এর পূর্ণ নাম কি?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

গত সংখ্যার প্রশ্ন সমূহের জবাব কারও সঠিক না হওয়ায় নতুন প্রশ্ন না রেখে পূর্বের প্রশ্নই রেখে দিলাম।

তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

৬৪। মোঃ মতিউর রহমান
পিতাঃ ইউসুফ আলী মোল্লা,
গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

৬৫। মোঃ আব্দুল মুকিত
পিতাঃ এজহারুল ইসলাম ওলিমিয়া
গ্রামঃ আলমপুর, পোঃ হবিগঞ্জ,
জেলাঃ হবিগঞ্জ–৩৩০০

৬৬। মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল বাতেন,
পিতাঃ আঃ সবুর ঢালী,
গ্রামঃ ধুমঘাট, পোঃ শিলতলা,
থানাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা।

৬৭। শেখ মুকিদুর রহমান,
পিতাঃ শেখ লুৎফর রহমান,
গ্রামঃ শিরোমনী (দক্ষিণপাড়া)
পোঃ শিরোমনি, খুলনা।

৬৮। মোঃ বশীর আহমেদ ফারুকী (বিপ্লব)
পিতাঃ আব্দুল হক ফারুকী,
জেনারেল সদর হাসপাতাল,
টাংগাইল।

৬৯। মোস্তাফিজুর রহমান (টুটুল)
পিতাঃ আব্দুল হালিম ফকির,
গ্রাম ও পোঃ সুকতাইল,
জেলা ও উপজেলাঃ গোপালগঞ্জ।

৭০। মাহফুজ আহমাদ চৌধুরী,
পিতাঃ মাওলানা ছেবাত আহমাদ চৌধুরী,
যোগারকুল (ফটাউলা),
আমনিয়ার বাজার, সিলেট।

৭১। মোঃ আব্দুল আজিজ ভূঞা,
পিতাঃ শুক্কুর আলী ভূঞা,
গ্রামঃ পাথাইল গাঁও, পোঃ গোয়ালতাবাজার,
থানাঃ ধুবাউড়া, ময়মনসিংহ।

৭২। আমির উদ্দীন খান,
পিতাঃ মোঃ লালখান,
গ্রামঃ ইছগাঁও, পোঃ কুবাজপুর,
থানা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৭৩। এস, এম, দেলোয়ার হোসাইন,
পিতাঃ আব্দুল করিম শেখ,
পশ্চিম বানিয়া খামার,
১৯৩, নং শের–এ বাংলা রোড, খুলনা।

৭৪। মোঃ আব্দুর রহমান চৌধুরী,
পিতাঃ মোঃ সফিকুর রহামন চৌধুরী,
খাদুরীয়া ছুপি আব্দুলগনি সাহেবের বাসা,
ফেনী।

৭৫। হাঃ মোঃ নজিরুল ইসলাম,
আলহাজ্ব কারী মোঃ ইব্রাহীম,
গ্রামঃ বামনীখোলা, পোঃ বদরপুর বাজার,
চান্দিনা, কুমিল্লা।

নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম ---------- বয়স ----------

পিতা ---------- শ্রেণী ----------

পূর্ণ ঠিকানা ----------

আমি এই মর্মে অঙ্গিকার করছি যে, আমার বয়স ১৮ বৎসরের উর্ধে নয়। আমি মুরুব্বীদের অনুমতি ক্রমে সাহিত্য চর্চা করব। আমি 'নবীন মুজাহিদদের পাতা'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং এই বিভঅগের সদস্য হতে আগহী।

স্বাক্ষর

এই কুপনটি কেটে পূরণ করে দুই টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট সহ আমাদের ঠিকানায় পাঠালে আমরা তাকে নবীন মুজাহিদদের সদস্য করে নিবে।

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা

চার ইজরাইলী সৈন্য নিহত

ফিলিস্তিনী হামাস গ্রুপের মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় চার জন ইসরাইলী সৈন্য নিহত হয়েছে। ইসরাইলী ইহুদী সরকার এর প্রতিশোধ মুলক ব্যবস্থা হিসেবে ৪১৮ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার ও পরে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে লেবাননে বহিঃষ্কার করে। লেবানন সরকার এসব ফিলিস্তিনিকে তার ভূখন্ডে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। বর্তমানে এইসব ফিলিস্তিনিরা প্রচণ্ড শীতে দুই দেশের সীমান্তে নিরপেক্ষ ও কুয়াশাচ্ছন্ন একটি খোলা পাহাড়ে অবস্থান করছে। হামাস ও ইসলামী জিহাদ আন্দোলন এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার শপথ নিয়েছে।

সত্যের পথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অপরাধে বহিষ্কার

কোন গেরিলা হামলা বা সরকারী সৈন্য নিহত করার ঘটনায় নয় ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করার অপরাধে অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র আরব আমিরাত ৭ শত পাকিস্তানী, আড়াইশত বাংলাদেশী বহিষ্কার করেছে। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব দেশগুলির দায়িত্ব সারা বিশ্বের মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ করা, কোন স্থানে মুসলমানদের স্বার্থ বিনষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু বাবরী মসজিদ ঘটনা নিয়ে আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়া খুবই মর্মপীড়াদায়ক। ভারতে মুসলিম নির্যাতন হচ্ছে, কাশ্মীরীদের দমন করার জন্য যা' কিছু সম্ভব ভারত সরকার করছে, মসজিদ ভাঙ্গছে এরপরও আরব দেশগুলি ভারতে তেল সরবরাহ করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ভারতের বিশ লক্ষ মানুষকে সেদেশের বিভিন্ন সেক্টরে চাকুরী করাচ্ছে। ইদানিং ভারতের খোলামেলা পরিবেশের ধারক বাহক অমুসলিম পতিতাদেরও তাদের গৃহ পরিচালনার কাজে নিয়োগ করছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, আরব বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান নেতৃত্ব মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে মোটেই যোগ্য নয়। বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী জাগরণ দেখা দিয়েছে তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করানোর দায়িত্ব পালনেও তারা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। সারা দুনিয়ার মুসলমান তাদের এমন কর্মকাণ্ডে হতাশ হয়েছে। তারা যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে মোটেও আন্তরিক নয় তা এর দ্বারাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই।

বসনিয় মুজাহিদদের একটি পাহাড় দখল

সার্বীয়রা সারাজেভোর সাথে বহিঃবিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র সংযোগ সড়কটি দখল করে নেয়ার পর বসনীয় মুজাহিদরা এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে সার্বদের নিয়ন্ত্রিত একটি পাহাড় দখল করেছে। চার দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর সার্বদের শক্ত ঘাটি ইলিয়া ও ভেগিস্তার মধ্যবর্তী একটি সড়কের ওপর জুগ নামক এইপাহাড়টি দখল করে নেয়।

ফিলিপাইনে ৪০ জন সৈন্য নিহত

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা থেকে ৮০০ কিলোঃ মিঃ দূরবর্তী এক গ্রামে মুসলিম বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষে চল্লিশ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। বন্দুকধারী মুসলিম বাহিনী মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে।

আলজেরীয়ায় সাত পুলিশ নিহত ও ১৩ জন মুজাহিদ শহীদ

আলজেরিয়ায় দুটি পৃথক ঘটনায় সাত জন পুলিশ নিহত ও ১৩ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। আরও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ৬ জন পুলিশ। মুসলিম মুজাহিদরা কার্ফ্যু চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে শহীদ হয়।

কাশ্মীরী মুজাহিদরা এক জোট হচ্ছে

কাশ্মীরের স্বাধীনতা পন্থী জে,কে, এল, এফ ও পাকিস্তান পন্থী হিজবুল মুজাহিদীন, আল জিহাদ গ্রুপ এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যেকার মতানৈক্য দূর করে এক প্লাটফর্মে একত্রিত হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী সবকটি গ্রুপ কাশ্মীরে গণভোট আয়োজন করবে এবং তারা তার ফলাফল মেনে নেবে। গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভবিষ্যত অর্থাৎ কাশ্মীর পাকিস্তানের সাথে যোগদিবে না স্বাধীন হবে তায় নির্ধারিত হবে। সম্প্রতি কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনী তাদের অভিযান জোরদার করা মুজাহিদরা একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্তে উপনীতহয়। এটা কাশ্মীরীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, জিহাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

গ্রন্থনায়ঃ মোহাম্মদ ফারুক হোসাইন খান

হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ

(২৩ পৃঃ পর)

কখনো দেখা বা শুনা যায়নি। এ ব্যাপারে পরিষদের লিডার সর্মার ভাষ্য, "এ ব্যাপারে কিছু সময় তো অবশ্যই নেবেই নতুবা এ সকল প্রদেশগুলোতে হিন্দু প্রথা প্রচলন পালনের জন্যে লোকদেরকে অবশ্যই বাধ্য করা হবে।"

চিন্তার বিষয় হলো এই যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্ম-কর্তাগণ বিগত ক্ষমতাশীন কংগ্রেস নেতাদের খুবই প্রশংসা করত। কেননা তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডে তখনকার ক্ষমতাসীনরা যথেষ্ট মদদ করত। বিশেষ করে সাবেক কংগ্রেস নেতা হরদেব জোশী তাদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছে। বর্তমান প্রাদেশিক বিজেপি সরকারের আছেই। তবে পেশকার ওয়ার্ডের মুসলমান এসেম্বলী মেম্বার মুসলিম প্রতিনিধি রমজান খানের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি। কেননা তিনি তাদের এ কর্ম কাণ্ডের চরম বিরোধী।

এ ব্যাপারে শংকরশর্মার মতামত হলো, আমরা আমাদের এ পরিকল্পনায় কোন রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিতে চাইনা, এজন্য যে, এক দলের সাহায্য নিতে গেলে অন্য দল এ পরিকল্পনাকে দলীয় করণ করতে চেষ্টা করবে।

মোটকথা এটা স্পষ্ট যে, সত্য সুন্দর শান্তির ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছেন। তারা বহু রকমের প্রবঞ্চনা ও প্রলোভনের শিকার। ষড়যন্ত্রের শিকার থেকে এদের রক্ষা করার দায়িত্ব কাদের? আমার এই জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন মুসলিম নেতৃবৃন্দগণ।

বেদার ডাইজেস্টের সৌজন্যে

হাঁপানী, মেদ–ভূঁড়ি ও যৌন রোগসহ পুরুষ ও মহিলাদের যাবতীয় রোগের সু–চিকিৎসা করা হয়

হাঁপানী?

হাঁপানী যে কি কষ্টদায়ক রোগ তা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝতে পারে না। আমরা হাঁপানী, কাশি ও ঠান্ডাজনিত রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা করে থাকি। আপনি যদি হাঁপানী রোগে ভুগে থাকেন তাহলে আমাদের পরামর্শ ও সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।

মেদ–ভূঁড়ি

অতিরিক্ত মেদ--ভূঁড়ি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা। আমরা সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে মেদ–ভূঁড়ি সমস্যার সমাধান করে থাকি। অসংখ্য মেদাক্রান্ত লোকের চিকিৎসা করে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। স্লীম ফিগারের জন্য আপনাকেও জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ।

যৌন রোগে ভুগছেন?

বিয়ের আগে ও পরের দুর্বলতা, যাবতীয় স্বাস্থ্যগত ও যৌন সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের পরামর্শ ও সু–চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ ও মধুময় দাম্পত্য জীবন–যাপন করুন।

বিঃ দ্রঃ– ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পুরাতন আমাশয়, বাত, স্পন্ডিলাইটিস, জন্ডিস, সাইনোসাইটিস, লিউকোরিয়া, মাথার টাক ও চুল পড়াসহ মহিলা ও পুরুষের যাবতীয় জটিল রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা করা হয়।

বিদেশী সহযোগিতায় তৈরী আধুনিক ম্যাসাজ অয়েল

ACO GENITAL

যা আপনার বিশেষ অঙ্গের দুর্বলতাকে দূর করে আরো বেশী সবল ও সুদৃঢ় করবে

আনে শক্তি
আনে সজিবতা
ফাইভ ফ্রুটস্ সিরাপ

বৈজ্ঞানিক ফর্মূলায় প্রস্তুত এবং পেষ্টের সমতুল্য ফেনাযুক্ত

এ্যাকো টুথপাউডার

নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতের যে কোন রোগ নিরাময় করে। দাঁতের গোড়া শক্ত ও মজবুত করে এবং দাঁত ঝকঝকে পরিষ্কার করে।

(মার্কেটিং বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে যোগাযোগ করুন)

সঠিক ও সু–চিকিৎসার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আলম এন্ড কোম্পানী

(হোমিও প্যাথিক ঔষধ আমদানীকারক, বিক্রেতা ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র)

- ১ম শাখাঃ ২, আর,কে, মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩, ফোনঃ ২৫৪১৪৩ (দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনকিলাবের মাঝে)
- ২য় শাখাঃ ৩১১, গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা–১২০৫ ফোনঃ ৫০৯০৯৯ (রূপালী ব্যাংকের পার্শ্বে)

শুক্রবার ও বন্ধের দিনসহ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

[illegible]

ইউনিক টেইলার্স

৫০, বায়তুল মোকাররম, ২য় তলা, ঢাকা

অত্যাধুনিক ও
রুচিসম্মত ডিজাইনের
খাঁটি গিনি সোনার
অলংকার
প্রস্তুতকারক
ও বিক্রেতা

ইউনিক জুয়েলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৪৩, বায়তুল মোকাররম (২য়তলা),
ঢাকা—১০০০ ফোন —২৪৩২৭৩

সহযোগী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

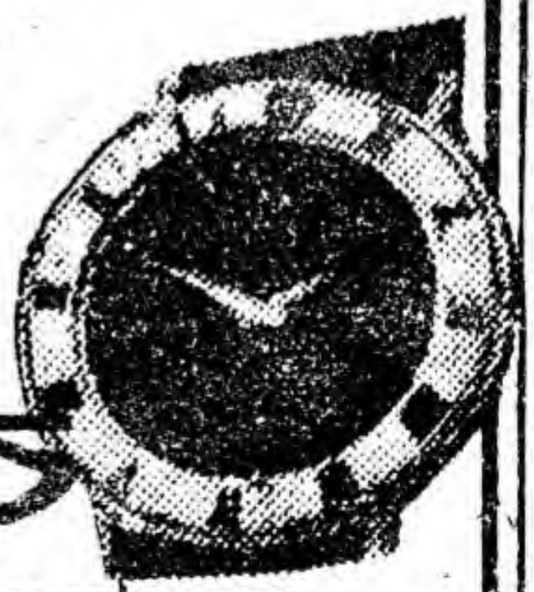

ইউনিক ওয়াচ

সর্বপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়

৩১, বায়তুল মোকাররম (দোতলা), ঢাকা

ফোন ঃ ২৩২৬৮০ বাসা ঃ ৪১৮৩৭৯

RG. DA. NO. 1101 ❑ MONTHLY JAGO MUJAHID ❑ JANUARY 1993 ❑ PRICE TAKA-7

হজ্জ্ব সেভিংস স্কীম

ইসলামী ব্যাংকের একটি সঞ্চয় প্রকল্প

যাঁরা হজ্জ্বের জন্য এক সাথে টাকা যোগাড় করতে অপারগ, তাঁরা এক বছর থেকে দশ বছর মেয়াদী এই স্কীমের আওতায় নিম্নেবর্ণিত মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে হজ্জ্বের জন্য সঞ্চয় গড়ে তুলে হজ্জ্ব পালনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

১০ বছরের	জন্য	মাসিক	জমা		৬০০.০০
৯	,,	,,	,,	,,	৭০০.০০
৮	,,	,,	,,	,,	৮০০.০০
৭	,,	,,	,,	,,	৯০০.০০
৬	,,	,,	,,	,,	১১০০.০০
৫	,,	,,	,,	,,	১৩০০.০০
৪	,,	,,	,,	,,	১৬৫০.০০
৩	,,	,,	,,	,,	২২০০.০০
২	,,	,,	,,	,,	৩৩০০.০০
১	,,	,,	,,	,,	৬৭০০.০০

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩ যদুনাথ বসাক লেন (টিপু সুলতান রোড), ঢাকা হতে মুদ্রিত